

# সাহিত্য কণিকা

## অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট  
ব্রজনেভের সাথে বঙ্গবন্ধু



যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল টিটোর সাথে  
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



১৯৭৪ সালের ১লা অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট  
জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



১৯৭২ সালের ২৭শে নভেম্বর জাতিসংঘের তৎকালীন  
মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্টেইম এর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মেলনে যোগদান করেন এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে দ্বিপক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন। এর মাধ্যমে ১১৬টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় এবং জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন (ন্যাম), ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি), ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনালসহ ২৭টি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ এবং গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

---

# সাহিত্য কণিকা

## অষ্টম শ্রেণি

### সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক

অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী

অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক

অধ্যাপক শ্যামলী আকবর

অধ্যাপক ড. সরকার আবদুল মান্নান

অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর

ড. শোয়াইব জিবরান

শামীম জাহান আহসান

### দ্বিতীয় পরিমার্জন

অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর

অধ্যাপক ড. শায়লা নাসরিন

পতিমোহন বিশ্বাস

শাহীনা কবির

---

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১১

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০২০

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২২

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করে। তাঁরই ধারাবাহিকতায় উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভিশন ২০৪১ সামনে রেখে পাঠ্যপুস্তকটি সময়োপযোগী করে পরিমার্জিত করা হয়েছে।

শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা সাহিত্য কগিকা শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটির অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবন ও জগতের বিচিত্র বিষয়ে কৌতুহলী হবে, পাঠাভ্যাসে আগ্রহ দেখাবে, পঠিত বিষয়ের মর্ম অনুধাবন এবং চিন্তনদক্ষতা ও রসসংগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। উল্লেখ্য যে, ২০২১ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তকটি সংশোধন ও পরিমার্জিত করা হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## সূচিপত্র

<b>বিষয়</b>	<b>লেখক</b>	<b>পৃষ্ঠা</b>
<b>গদ্য</b>		
১. অতিথির স্মৃতি	শরঞ্জন্দ চট্টোপাধ্যায়	১
২. ভাব ও কাজ	কাজী নজরুল ইসলাম	৭
৩. পড়ে পাওয়া	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩
৪. তৈলচিত্রের ভূত	মালিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২২
৫. এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	শেখ মুজিবুর রহমান	৩১
৬. আমাদের লোকশিল্প	কামরুল হাসান	৩৮
৭. সুখী মানুষ	মমতাজউদ্দীন আহমদ	৪৬
৮. শিল্পকলার নানা দিক	মুস্তাফা মনোয়ার	৫৪
৯. মংডুর পথে	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	৬০
১০. বাংলা নববর্ষ	শামসুজ্জামান খান	৬৭
১১. বাংলা ভাষার জন্মকথা	হুমায়ুন আজাদ	৭৪
<b>কবিতা</b>		
১. মানবধর্ম	লালন শাহ	৮০
২. বঙ্গভূমির প্রতি	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৮৪
৩. দুই বিঘা জমি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৮
৪. পাছে লোকে কিছু বলে	কামিনী রায়	৯৫
৫. প্রার্থনা	কায়কোবাদ	৯৯
৬. বাবুরের মহত্ত্ব	কালিদাস রায়	১০২
৭. নারী	কাজী নজরুল ইসলাম	১০৮
৮. আবার আসিব ফিরে	জীবনানন্দ দাশ	১১৩
৯. বৃপাই	জসীমউদ্দীন	১১৭
১০. নদীর স্বপ্ন	বুদ্ধদেব বসু	১২১
১১. জগো তবে অরণ্য কল্যারা	সুফিয়া কামাল	১২৫
১২. প্রার্থী	সুকান্ত ভট্টাচার্য	১২৯
১৩. একুশের গান	আবদুল গাফফার চৌধুরী	১৩৩

# অতিথির সূতি

শ্রদ্ধলু চট্টগ্রাম



চিকিৎসকের  
আদেশে দেওবরে  
এসেছিলাম বায়ু  
পরিবর্তনের জন্যে।  
প্রাচীর ষেরা  
বাগানের মধ্যে  
একটা বড় বাড়িতে  
থাকি। রাত্রি  
ভিনটে থেকে  
কাছে কোথাও  
একজন গলাভাঙ্গা

একবেগে সুরে ভজন শুরু করে, ঘূম ভেঙে যায়, দোর খুলে বারান্দায় এসে বসি। ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হয়ে আসে— পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়। দেখতাম ওদের মধ্যে সবচেয়ে শোরে ওঠে দোহেল। অস্থকার শেষ না হতেই তাদের গান আরম্ভ হয়, তারপরে একটি দৃঢ়ি করে আসতে থাকে বুলবুলি, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি— পাশের বাড়ির আমগাছে, এ বাড়ির বকুল-কুঞ্জে, পথের ধারের অশুধগাছের মাথায়— সকলকে ঢাঁকে দেখতে প্রেতাম না, কিন্তু প্রতিদিন ডাক শোনার অভ্যাসে মনে হতো যেন ওদের প্রত্যেককেই চিনি। হলদে  
রঞ্জের একজোড়া বেনে-বৌ পাখি একটু দেরি করে আসত। প্রাচীরের ধারের ইউক্যালিপটাস গাছের সবচেয়ে  
উচ্চ ডালটায় বসে তারা প্রত্যহ হাজিরা হেকে যেত। হঠাতে কী জানি কেন দিন-দুই এলো না দেখে ব্যস্ত হয়ে  
উঠলাম, কেউ ধরলে না তো? এদেশে বাধের অভাব নেই, পাখি চালান দেওয়াই তাদের ব্যবসা— কিন্তু তিনি  
দিনের দিন আবার দৃঢ়িকে ফিরে আসতে দেখে মনে হলো যেন সত্যিকার একটা ভাবনা ঘূঁটে পেল।

এমনি করে সকাল কাটে। বিকালে গেটের বাইরে পথের ধারে এসে বসি। নিজের সামর্থ্য নেই বেড়াবাব, যাদের আছে তাদের প্রতি চেয়ে চেয়ে দেখি। দেখতাম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পীড়িতদের মধ্যে যেয়েদের সংখ্যাই ত্রে  
বেশি। প্রথমেই যেত পা ফুলো-ফুলো অল্পবয়সী একদল যেয়ে। বুরাতাম এরা বেরিবেরির আসামি। ফোলা  
পায়ের লজ্জা ঢাকতে বেচারাদের কত না যত্ন। যোজা পরার দিন নয়, গরম পড়েছে, তবু দেখি কারণ পায়ে  
আঁট করে যোজা পরা। কেউ বা দেখলাম মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে কাপড় পরেছে— সেটা পথ চলার বিষ্ণ, তবু,  
কৌতুহলী লোকচক্ষ থেকে তারা বিকৃতিটা আড়াল রাখতে চায়। আর সবচেয়ে দুঃখ হতো আমার একটি  
দরিদ্র ঘরের যেয়েকে দেখে। সে একলা যেত। সঙ্গে আত্মায়-স্বজন নেই, শুধু তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।  
শক্তি নেই নিজের দেহটাকে টানবাব, তবু সবচেয়ে ছোট ছেলেটি তার কোলে। সে তো আর হাঁটতে পারে না—

অথচ, ফিরে আসবারও ঠাই নেই ? কী ক্লান্তই না মেয়েটির চোখের চাহনি !

সেদিন সন্ধ্যার তখনও দেরি আছে, দেখি জনকয়েক বৃন্দ ব্যক্তি ক্ষুধা হরগের কর্তব্যটা সমাধা করে যথাশক্তি দ্রুতপদেই বাসায় ফিরছেন। স্কুলে এরা বাতব্যাধিগ্রন্ত, সন্ধ্যার পূর্বেই এদের ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। তাঁদের চলন দেখে ভরসা হলো, ভাবলাম যাই, আমিও একটু ঘুরে আসিগে। সেদিন পথে পথে অনেক বেড়ালাম। অন্ধকার হয়ে এলো, ভেবেছিলাম আমি একাকী, হঠাতে পেছনে চেয়ে দেখি একটি কুকুর আমার পেছনে চলেছে। বললাম, কী রে, যাবি আমার সঙ্গে? অন্ধকার পথটায় বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিতে পারবি? সে দূরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল। বুবলাম সে রাজি আছে। বললাম, তবে আয় আমার সঙ্গে। পথের ধারের একটা আলোতে দেখতে পেলাম কুকুরটার বয়স হয়েছে; কিন্তু যৌবনে একদিন শক্তিসামর্য্য ছিল। তাকে অনেক কিছু প্রশ্ন করতে করতে বাড়ির সমুখে এসে পৌছলাম। গেট খুলে দিয়ে ডাকলাম, ভেতরে আয়। আজ তুই আমার অতিথি। সে বাইরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল, কিছুতে ভেতরে ঢোকার ভরসা পেল না। আলো নিয়ে চাকর এসে উপস্থিত হলো, গেট বন্ধ করে দিতে চাইল, বললাম, না, খোলাই থাক। যদি আসে, ওকে খেতে দিস। ঘণ্টাখানেক পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম সে আসে নি— কোথায় চলে গেছে।

পরদিন সকালে বাইরে এসেই দেখি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার সেই কালকের অতিথি। বললাম, কাল তোকে খেতে নেমন্তন্ত্র করলাম, এলিনে কেন?

জবাবে সে মুখপানে চেয়ে তেমনি ল্যাজ নাড়তে লাগল। বললাম, আজ তুই খেয়ে যাবি,— না খেয়ে যাসনে বুবলি? প্রত্যুষের সে শুধু ঘন ঘন ল্যাজ নাড়ল— অর্থ বোধ হয় এই যে, সত্যি বলছো তো?

রাত্রে চাকর এসে জানাল সেই কুকুরটা এসে আজ বাইরের বারান্দার নিচে উঠানে বসে আছে। বামুনঠাকুরকে ডেকে বলে দিলাম, ও আমার অতিথি, ওকে পেট ভরে খেতে দিও।

পরের দিন খবর পেলাম অতিথি যায় নি। আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। বললাম, তা হোক, ওকে তোমরা খেতে দিও।

আমি জানতাম, প্রত্যহ খাবার তো অনেক ফেলা যায়, এতে কারও আপত্তি হবে না। কিন্তু আপত্তি ছিল এবং অত্যন্ত গুরুতর আপত্তি। আমাদের বাড়িত খাবারের যে প্রবল অংশীদার ছিল এ বাগানের মালির মালিনী— এ আমি জানতাম না। তার বয়স কম, দেখতে ভালো এবং খাওয়া সম্বন্ধে নির্বিকারচিত। চাকরদের দরদ তার পরেই বেশি। অতএব, আমার অতিথি করে উপবাস। বিকালে পথের ধারে গিয়ে বসি, দেখি অতিথি আগে খেকেই বসে আছে ধূলোয়। বেড়াতে বার হলে সে হয় পথের সঙ্গী; জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁ অতিথি, আজ মাংস রান্নাটা কেমন হয়েছিল রে? হাড়গুলো চিবোতে লাগল কেমন? সে জবাব দেয় ল্যাজ নেড়ে, মনে করি মাংসটা তা হলে ওর ভালোই লেগেছে। জানিনে যে মালির বউ তারে মেরেধরে বার করে দিয়েছে— বাগানের মধ্যে ঢুকতে দেয় না, তাই ও সমুখের পথের ধারে বসে কাটায়। আমার চাকরদেরও তাতে সায় ছিল।

হঠাতে শরীরটা খারাপ হলো, দিন-দুই নিচে নামতে পারলাম না। দুপুরবেলা উপরের ঘরে বিছানায় শুয়ে, খবরের কাগজটা মেইমাত্র পাড়া হয়ে গেছে, জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের ঝোলুকগুলি নীল আকাশের পানে চেয়ে অন্যমনক্ষ হয়ে ভাবছিলাম। সহসা খোলা দোর দিয়ে সিঁড়ির উপর ছায়া পড়ল কুকুরের। মুখ বাড়িয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। দুপুরবেলা চাকরেরা সব ঘুমিয়েছে, ঘর তাদের বন্ধ, এই সুযোগে লুকিয়ে সে একেবারে আমার ঘরের সামনে এসে হাজির। ভাবলাম, দুদিন দেখতে পায় নি, তাই বুবি আমাকে ও দেখতে এসেছে। ডাকলাম, আয় অতিথি, ঘরে আয়। সে এলো না, সেখানে দাঁড়িয়েই ল্যাজ নাড়তে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম—

খাওয়া হয়েছে তো রে? কী খেলি আজ?

হঠাতে মনে হলো ওর চোখ দুটো যেন ভিজেভিজে, যেন গোপনে আমার কাছে কী একটা নালিশ ও জানাতে চায়। চাকরদের হাঁক দিলাম, ওদের দোর খোলার শব্দেই অতিথি ছুটে পালাল।

জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ রে, কুকুরটাকে আজ থেতে দিয়েছিস?

আজ্ঞে না। মালি-বৌ ওরে তাড়িয়ে দিয়েছে যে।

আজ তো অনেক খাবার বেঁচেছে, সে সব হলো কী?

মালি-বৌ চেঁচেপুঁছে নিয়ে গেছে।

আমার অতিথিকে ডেকে আনা হলো, আবার সে বারান্দার নিচে উঠানের ধুলোয় পরম নিশ্চিন্তে স্থান করে নিল। মালি-বৌয়ের ভয়টা তার গেছে। বেলা যায়, বিকাল হলে উপরের বারান্দা থেকে দেখি অতিথি এই দিকে চেয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। বেড়াতে যাবার সময় হলো যে।

শরীর সারলো না, দেওঘর থেকে বিদায় নেবার দিন এসে পড়ল। তবু দিন-দুই দেরি করলাম নানা ছল। আজ সকাল থেকে জিনিস বাঁধাবাঁধি শুরু হলো, দুপুরের ট্রেন। গেটের বাইরে সার সার গাঢ়ি এসে দাঁড়াল, মালপত্র বোবাই দেওয়া চলল। অতিথি মহাব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে খবরদারি করতে লাগল, কোথাও যেন কিছু খোয়া না যায়। তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি।

একে একে গাড়িগুলো ছেড়ে দিলে, আমার গাড়িটাও চলতে শুরু করল। স্টেশন দূরে নয়, সেখানে পৌছে নামতে গিয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে। কী রে, এখানেও এসেছিস? সে ল্যাজ নেড়ে তার জবাব দিল, কী জানি মানে তার কী!

টিকিট কেনা হলো, মালপত্র তোলা হলো, ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা বকশিশ পেল সবাই, পেল না কেবল অতিথি। গরম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে, যাবার আগে তারই মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম— স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি। ট্রেন ছেড়ে দিলে, বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল, অতিথি আজ ফিরে গেয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ, চুকবার জো নেই! পথে দাঁড়িয়ে দিন-দুই তার কাটবে, হয়তো নিষ্কৃত মধ্যহের কোনো ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা। হয়তো, ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই, তবু দেওঘরে বাসের কটা দিনের স্মৃতি ওকে মনে করেই লিখে রেখে গেলাম।

### শব্দার্থ ও টীকা

- |          |  |
|----------|--|
| ভজন      | — ঈশ্বর বা দেবদেবীর স্মৃতি বা মহিমাকীর্তন। প্রার্থনামূলক গান।  |
| দোর      | — দুয়ার বা দরজা। বাড়ির ফটক।  |
| কুঞ্জ    | — লতাপাতায় আচ্ছাদিত বৃত্তাকার স্থান, উপবন।  |
| বেরিবেরি | — বি ভিটামিনের অভাবে হাত-পা ফুলে যাওয়া রোগ।   |
| আসামি    | — এ শব্দটি দিয়ে সাধারণত আদালতে কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে রোগক্রান্তদের বোঝানো হয়েছে। |
| পাড়ুর   | — ফ্যাকাশে।  |
| মালি     | — মালা রচনাকারী, মালাকর। বেতনের বিনিময়ে বাগানের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি।   |
| মালিনী   | — মালির স্ত্রী।  |

## পাঠের উদ্দেশ্য

এ গল্প পড়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। নতুন কোনো জায়গা ভ্রমণ করলে ওই অভিজ্ঞতা লিখে রাখতেও আগ্রহী হবে।

## পাঠ-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘দেওঘরের স্মৃতি’ গল্পটির নাম পাল্টে এবং ঈষৎ পরিমার্জনা করে এখানে ‘অতিথির স্মৃতি’ হিসেবে সংকলন করা হয়েছে। একটি প্রাণীর সঙ্গে একজন অসুস্থ মানুষের কয়েকদিনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ময়ত্বের সম্পর্কই এ গল্পের বিষয়। লেখক দেখিয়েছেন, মানুষে-মানুষে যেমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক অন্য জীবের সঙ্গেও মানুষের তেমন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই সম্পর্ক নানা প্রতিকূল কারণে স্থায়ীরূপ পেতে বাধাগ্রস্ত হয়। আবার এই সম্পর্কের সূত্র ধরে একটি মানুষ ওই জীবের প্রতি যখন মমতায় সিন্ত হয় তখন অন্য মানুষের আচরণ নির্মম হয়ে উঠতে পারে। এ গল্পে সম্পর্কের এই বিচিত্র বৃপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

## লেখক-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কৈশোর ও যৌবনের অধিকাংশ সময় ভাগলপুরের মাতুলালয়ে অতিবাহিত হয়। তিনি কলেজশিক্ষা শেষ করতে পারেননি। ১৯০৩ সালে জীবিকার সঙ্গানে রেঙ্গুন যাত্রা করেন। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তিনি রেঙ্গুনে ছিলেন এবং সেখানে অবস্থানকালে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিরোগ করেন। ১৯০৭ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘বড়দিদি’ উপন্যাস প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এরপর একের পর এক গল্প-উপন্যাস লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকে পরিণত হন। সাধারণ বাঙালি পাঠকের আবেগকে তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে: ‘পল্লীসমাজ’, ‘দেবদাস’, ‘শ্রীকান্ত’ (চার পর্ব), ‘গৃহদাহ’, ‘দেনাপাওনা’, ‘পথের দাবী’, ‘শেষ প্রশং’ প্রভৃতি। সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্গপদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট. উপাধি লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যের এই কালজয়ী কথাশিল্পীর জীবনাবসান ঘটে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায়।

## কর্ম-অনুশীলন

- ক. তোমার অভিজ্ঞতা থেকে একটি ভ্রমণকাহিনির বিবরণ লেখ (একক কাজ)।
- খ. তোমার প্রিয় কোনো পশু বা পাখির কোন কোন আচরণ তোমার কাছে মানুষের আচরণের মতো মনে হয়, তার একটি বর্ণনা দাও (একক কাজ)

## নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাত ব্যাধিগ্রস্ত রোগীরা কখন ঘরে প্রবেশ করে?
 

ক. সন্ধ্যার পূর্বে	খ. সন্ধ্যার পরে
গ. বিকেল বেলা	ঘ. গোধূলি বেলা

২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি পেয়েছেন?

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ক. ঢাকা      | খ. কলকাতা   |
| গ. অক্সফোর্ড | ঘ. কেমব্ৰিজ |

৩. আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন বলতে কী বোঝায়?

- i. কোনো তিথি না মেনে কারো আগমনকে
- ii. মাত্রাতিরিক্ত সময় আতিথ্যেতা গ্রহণ করাকে
- iii. অবাঞ্ছিতভাবে কোনো অতিথির অধিক সময় অবস্থানকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |                |
|--------|----------------|
| ক. i   | খ. i ও ii      |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

#### উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বাবা-মার আদরের দুই ছেলে আশিক ও আকাশ এবার ক্লাস টুতে পড়ে। ওদের বাবা একদিন ছেট খাঁচায় একটি ময়না পাখি উপহার দেয়। সেই থেকে সারাক্ষণ দুই ভাই প্রতিযোগিতা করে পাখিটিকে খাবার ও পানি দেওয়া, কথা বলা আর কথা শেখানোর আন্দোলন চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু একদিন সকালে দেখে, বিড়াল এসে রাতে পাখিটাকে মেরে ফেলেছে। সেই থেকে যে তাদের অবোর ধারায় কান্না, কেউ আর থামাতেই পারে না। আজও সেই ময়নার কথা মনে হলে ওরা কেঁদে ওঠে।

৪। উদ্দীপকে ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

- i. পশু-পাখির সাথে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক
- ii. পশু-পাখির সাথে মানুষের স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক
- iii. ভালোবাসায় সিঙ্গ পশু-পাখির বিচ্ছেদ বেদনায় কাতরতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি নিচের কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে?

- ক. বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না
- খ. আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে
- গ. অতএব আমার অতিথি উপবাস করে
- ঘ. তা হোক, ওকে তোমরা খেতে দিও

## সূজনশীল প্রশ্ন

১. দরিদ্র বর্গাচারি গফুরের অতি আদরের একমাত্র শাঁড় মহেশ। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে ওকে ঠিকমত খড়-বিচুলি খেতে দিতে পারে না। জমিদারের কাছে সামান্য খড় ধার ঢেয়েও পায় না। নিজে না খেয়ে থাকলেও গফুরের দুঃখ নেই। কিন্তু মহেশকে খাবার দিতে না পেরে তার বুক ফেটে যায়। সে মহেশের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে— মহেশ, তুই আমার ছেলে। তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস। তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারি নে, কিন্তু তুই তো জানিস আমি তোকে কত ভালোবাসি। মহেশ প্রতুত্তরে গলা বাড়িয়ে আরামে ঢাখ বুজে থাকে।
- ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়জ্ঞানেও ঘরে যাওয়ার কারণ কী?
- খ. অতিথি কিছুতে ভিতরে ঢোকার ভরসা পেল না কেন? ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকে মহেশের প্রতি গফুরের আচরণে ‘অতিথির সৃতি’ গল্পের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকের গফুরের সাথে লেখকের চেতনাগত মিল থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন—‘অতিথির সৃতি’ গল্পের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।
২. লালমনিরহাটের যুবায়ের প্রায় ১০ বছর ধরে তার পোষাহাতি, কালাপাহাড়কে দিয়ে লাকড়ি টানা, চাষ করা, সার্কাস দেখানো ইত্যাদি কাজ করে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে দারিদ্র্যের কারণে হাতির খোরাক জোগাড় করতে না পেরে একদিন সে কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দিল। ক্রেতা কালাপাহাড়কে নিতে এসে ওর পায়ে বাঁধা রশি ধরে হাজার টানাটানি করে একচুলও নাড়াতে পারল না। কালাপাহাড়ের দুচোখ বেয়ে শুধু টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। পরদিন খন্দের আরও বেশি লোকজন সাথে করে এসে কালাপাহাড়কে নিয়ে যাবে বলে চলে যায়। কিন্তু ভোরবেলা যুবায়ের দেখে—কালাপাহাড় মরে পড়ে আছে। হাউমাউ করে সে চিন্কার করে আর বলে—‘ওরে আমার কালাপাহাড়, অভিমান করে তুই চলে গেলি!'
- ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন পদক লাভ করেন?
- খ. লেখক দেওয়ের থেকে বিদায় নিতে নানা অজুহাতে দিন দুই দেরি করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ. কালাপাহাড়ের আচরণ ‘অতিথির সৃতি’ গল্পের অতিথির আচরণ কীভাবে ভিন্ন—বর্ণনা কর।
- ঘ. ‘উদ্দীপকের যুবায়ের এর অনুভূতি আর ‘অতিথির সৃতি’ গল্পের লেখকের অনুভূতি একই ধারায় উৎসারিত’—মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

## ভাব ও কাজ

কাজী নজরুল ইসলাম



ভাবে আর কাজে সম্ভটা খুব  
নিকট বোধ হইলেও আদতে এ-জিনিস  
দুইটায় কিন্তু আসমান-জমিন তফাং।  
ভাব জিনিসটা হইতেছে পৃষ্ঠবিহীন  
সৌরভের মতো, একটা অবাস্থব  
উচ্ছ্঵াস মাত্র। তাই বলিয়া কাজ  
মানে যে সৌরভবিহীন পৃষ্ঠ, ইহা যেন  
কেহ মনে করিয়া না বসেন। কাজ  
জিনিসটাই ভাবকে রূপ দেয়, ইহা  
সম্পূর্ণভাবে বঙ্গজগতের।

তাই বলিয়া ভাবকে যে আমরা মন্দ  
বলিতেছি বা নিন্দা করিতেছি, তাহা  
নহে; ভাব জিনিসটা খুবই ভালো।  
মানুষকে কজায় আনিবার জন্য তাহার  
সর্বাপেক্ষা কোমল জাগুগায় ছোওয়া  
দিয়া তাহাকে মাতাইয়া না তুলিতে  
পারিলে তাহার স্বারা কোনো কাজ  
করানো যায় না, বিশেষ করিয়া  
আমাদের এই ভাব-পাগলা দেশে। কিন্তু

শুধু ভাব লইয়াই থাকিব, লোককে শুধু কথায় মাতাইয়া শশগুল করিয়াই রাখিব, এও একটা মন্দ  
বদ-খেয়াল। এই ভাবকে কার্যের দোসরূপে নিয়োগ করিতে না পারিলে ভাবের কোনো সার্থকতাই থাকে  
না। তাহা ছাড়া ভাব দিয়া লোককে মাতাইয়া তুলিয়া যদি সেই সময় গরমাগরম কার্যসিদ্ধি করাইয়া লওয়া  
না হয়, তাহা হইলে পরে সে ভাবাবেশ কর্পুরের মতো উড়িয়া যায়। অবশ্য, এখানে কার্যসিদ্ধি মানে স্বার্থসিদ্ধি  
নয়। যিনি ভাবের বাঁশি বাজাইয়া জনসাধারণকে নাচাইবেন, তাঁহাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগী কৰি হইতে হইবে।  
তিনি লোকদিগের সূক্ষ্ম অনুভূতি বা ভাবকে জাগাইয়া তুলিবেন মানুষের কল্যাণের জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির  
জন্য নয়। তাঁহাকে একটা খুব মহসুর উদ্দেশ্য ও কল্যাণ কামনা লইয়া ভাবের বন্যা বহাইতে হইবে,  
নতুবা বানভাসির পর পলিপড়ার মতো সাধারণের সমস্ত উৎসাহ ও প্রাণ একেবারে কাদাটাকা পড়িয়া যাইবে।  
এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, লোকের কোমল অনুভূতিতে ঘা দেওয়া পাপ। কেননা অনেক সময় অনুপযুক্ততা  
প্রযুক্ত ইহা হইতে সুকল না ফলিয়া কুকলই ফলে। আগে হইতে সমস্ত কার্যের বদ্দোবন্ধ করিয়া বা কার্যক্ষেত্র  
তৈয়ার রাখিয়া তবে লোকদিগকে সোনার কাঠির ছোওয়া দিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে। নতুবা তাহারা যখন  
জাগিয়া দেখিবে যে, তাহারা অনর্থক জাগিয়াছে, কোনো কার্য করিবার নাই, তখন যহা বিরক্ত হইয়া আবার  
যুমাইয়া পড়িবে এবং তখন আর জাগাইলেও জাগিবে না। কেননা, তখন যে তাহারা জাগিয়া যুমাইবে এবং  
জাগিয়া যুমাইলে তাহাকে কেহই তুলিতে পারে না। তাহা অপেক্ষা বরং কুস্তকর্ণের নিদ্রা ভালো, সে-সূয়

চোল কাঁসি বাজাইয়া ভাঙানো বিচিত্র নয়।

এ-কথাটা একটা মন্ত সত্যি, তাহা এতদিনে আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। এই যে সেদিন একটা হজুগে মাতিয়া হড়হড় করিয়া হাজার কতক স্কুল-কলেজের ছাত্রদল বাহির হইয়া আসিল, কই তাহারা তো তাহাদের এই সৎ সঙ্গল, এই মহৎ ত্যাগকে স্থায়ীরূপে বরণ করিয়া লইতে পারিল না। কেন এমন হইল? একটা সাময়িক উভেজনার মুখে এই ত্যাগের অভিনয় করিতে গিয়া ‘স্প্রিট’কে কী বিশ্বী ভাবেই না মুখ ভ্যাঙ্চানো হইল! যাহারা শুধু ভাবের চোটে না বুঝিয়া না শুনিয়া শুধু একটু নামের জন্য বা বদনামের ভয়ে এমন করিয়া তাহাদের ‘স্প্রিট’ বা আত্মার শক্তির পবিত্রতা নষ্ট করিল, তাহারা কি দরকার পড়িলে আবার কাল এমনি করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে? আজ যাহারা মুখে চানৰ জড়াইয়া কল্যাকার ত্যক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার মুখটি চুন করিয়া চুকিল, কাল দেশের সত্যিকার ডাক আসিলে তাহারা কি আর তাহাতে সাড়া দিতে পারিবে? হঠকারিতা করিয়া একবার যে ভোগটা ভুগিল বা ভ্রম করিল, তাহারই অনুশোচনাটা তাহারা কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না—বাহিরে যতই কেন লা-পরওয়া ভাব দেখাক না। এখন সত্যিকার ডাক শুনিয়া প্রাণ চাহিলেও সে লজ্জায় তাহাতে আসিয়া যোগদান করিতে পারিবে না। এই রূপে আমরা আমাদের দেশের প্রাণশক্তি এই তরণদের ‘স্প্রিট’টাকে কুব্যবহারে আনিয়া মঙ্গলের নামে দেশের মহা শক্রতা সাধনই করিতেছি না কি? রাগিবার কথা নয়, এখন ইহা রীতিমতো বিবেচনা-সাপেক্ষ। আমাদের এই আশা-ভরসাস্থল যুবকগণ এত দুর্বল হইল কীরূপে বা এমন কাপুরুষের মতো ব্যবহারই বা করিল কেন? সে কি আমাদেরই দোষে নয়? সাপ লইয়া খেলা করিতে গেলে তাহাকে দঙ্গরমতো সাপুড়ে হওয়া চাই, শুধু একটু বাঁশি বাজাইতে পারিলেই চলিবে না। আজ যদি সত্যিকার কর্মী থাকিত দেশে, তাহা হইলে এমন সুর্বজ্ঞ সুযোগ মাঝ-মাঝে মাঝ যাইত না। ত্যাগী অনেক আছেন দেশে, কিন্তু কর্মীর অভাবে বা তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের সত্য সাধনার অভাবে তাঁহারা কোনো ভালো কাজে আর কোনো অর্থ দিতে চাহেন না, বা অন্য কোনোরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতেও রাজি নন। কী করিয়া হইবেন? তাঁহারা তাঁহাদের চোখের সামনে দেখিতেছেন যে, কতো লোকের কতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ধন দেশের নামে, কল্যাণের নামে আদায় করিয়া বাজে লোকে নিজেদের উদর পূর্ণ করিতেছে। যাঁহারা সত্যিকার দেশকর্মী—সে বেচারারা সত্যি কথা স্পষ্টভাবে বলিতে গিয়া এই সব কর্মীর কারচুপিতে পুয়ালচাপা পড়িয়া গিয়াছে। বেচারারা এখন ভালো বলিতে গেলেও এই সব মুখোশ-পরা ত্যাগী মহাপুরুষগণ হউগোল বাধাইয়া লোককে সম্পূর্ণ উল্টা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে একদম খেলো, বুটা ইত্যাদি প্রমাণ করিয়া দেন। সহজ জনসাধারণের সরল মন এ-সব না ধরিতে পারার দরশন তাহাদের মন অতি অল্পেই ঐ সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া উঠে। ‘দশচক্রে ভগবান ভূত’ কথাটা মন্ত সত্যি কথা।

তাহা হইলে এখন উপায় কী? এক সহজ উপায় এই যে, এখন হইতে জনসাধারণের বা শিক্ষিত কেন্দ্রের উচিত, ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহুল হইয়া কাঞ্চকাঞ্চ ভালোমন্দ জ্ঞান হারাইয়া না ফেলা। আমরা বলিব, ভাবের সুরা পান করো ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইও না। তাহা হইলে তোমার পতন, তোমার দেশের পতন, তোমার ধর্মের পতন, মনুষ্যত্বের পতন! ভাবের দাস হইও না, ভাবকে তোমার দাস করিয়া লও। কর্মে শক্তি আনিবার জন্য ভাব-সাধনা কর। ‘স্প্রিট’ বা আত্মার শক্তিকে জাগাইয়া তোল, কিন্তু তাই বলিয়া কর্মকে হারাইও না। অঙ্গের মতো কিছু না বুঝিয়া না শুনিয়া ভেড়ার মতো পেছন ধরিয়া চলিও না। নিজের বুদ্ধি, নিজের কর্মশক্তিকে জাগাইয়া তোল। তোমার এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই দেশকে উন্নতির দিকে, মুক্তির দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে। এ-সব জিনিস ভাব-আবিষ্ট হইয়া চক্ষু বুজিয়া হয় না। কোমর বাঁধিয়া কার্যে নামিয়া

পড়িতে হইবে এবং নামিবার পূর্বে ভালো করিয়া বুঝিয়া-সুবিয়া দেখিয়া লইতে হইবে, ইহার ফল কী। শুধু উদ্মো ষাঢ়ের মতো দেওয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁষড়াইয়া নিজের চামড়া তুলিয়া ফেলা হয় মাত্র। দেওয়াল প্রভু কিন্তু দিবিয় দাঁড়াইয়া থাকেন। তোমার বন্ধন ওই সামনের দেওয়ালকে ভাঙ্গিতে হইলে একেবারে তাহার ভিত্তিমূলে শাবল মারিতে হইবে।

আবার বলিতেছি, আর ভাবের ঘরে চুরি করিও না। আগে ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখ। কার্যের সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার কথা অগ্রে বিবেচনা করিয়া পরে কার্যে নামিলে তোমার উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হইবে না। মনে রাখিও তোমার ‘স্পিরিট’ বা আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করিতে তোমার কোনো অধিকার নাই। তাহা পাপ—মহাপাপ!

### শব্দার্থ ও টীকা

---

আসমান	— আকাশ।
জমিন	— মাটি, ভূ-পৃষ্ঠ।
কজায়	— আয়ন্তে, অধিকারে।
মশগুল	— মগ্ন, বিভোর।
বদ-খেয়াল	— খারাপ চিন্তা, খারাপ আচরণ।
দাদ	— প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা।
কর্পূর	— বৃক্ষরস থেকে তৈরি গন্ধুরব্য বিশেষ যা বাতাসের সংস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যে ক্ষয়প্রাণ হয়।
ঝৰি	— শাস্ত্রজ্ঞ তপস্থী, মুনি, যোগী।
বানভাসি	— বন্যায় ভাসানো, বন্যায় যা বা যাদের ভাসিয়ে আনে।
বন্দোবন্ত	— ব্যবস্থা, আয়োজন।
অনর্থক	— ব্যর্থ, নিষ্কল, অকারণ।
কুস্তকর্ণ	— রামায়ণে বর্ণিত রাবণের ছোট ভাইয়ের নাম। সে একনাগাড়ে ছয় মাস ঘুমাতো। এখানে যে খুব ঘুমায় বা সহজে যাকে জাগানো যায় না।
হজুগ	— সাময়িক আন্দোলন, জনরব, গুজব।
সঙ্কল্প	— প্রতিজ্ঞা, শপথ।
স্পিরিট	— ইংরেজি Spirit শব্দটির অর্থ উদ্দীপনা, উৎসাহ, শক্তি। এ প্রবন্ধে ‘আত্মার শক্তির পরিব্রতা’ অর্থে স্পিরিট শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কল্যকার — পূর্ব বা পরবর্তী দিন। এখানে পূর্বের দিন অর্থে।

লা-পরওয়া — গ্রাহ্য না করা।

দম্পত্তির মতো — রীতিমতো, যথেষ্ট, নিতান্ত।

সুবর্ণ — সোনা, স্বর্ণ।

পুরাল — খড়।

দশচক্রে ভগবান ভূত — দশজনের চক্রান্তে সাধুও অসাধু প্রতিপন্ন হতে পারে, বহুলোকের ষড়যন্ত্রে  
অসম্ভবও সম্ভব হয়।

কাঞ্চকাণ্ড — ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ।

উদ্মো শাঁড় — বন্ধনমুক্ত শাঁড়।

প্ররোচনা — উসকানি, উদ্দেজনা সৃষ্টি।

### পাঠের উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধ পাঠ করে শিক্ষার্থীরা মহৎ কাজের জন্য অনুপ্রাণিত হবে। শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হওয়া নয়,  
ভাবের সঙ্গে পরিকল্পিত কর্মশক্তি ও বাস্তব উদ্যোগের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হবে।

### পাঠ-পরিচিতি

‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধটি নেওয়া হয়েছে ‘যুগবাণী’ গ্রন্থ থেকে। ভাব ও কাজের মধ্যে পার্থক্য অনেক। মানুষকে  
উদ্বৃদ্ধ করার জন্য ভাবের গুরুত্ব অপরিসীম কিন্তু শুধু ভাব দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তার জন্য  
কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দরকার হয়। ভাবের দ্বারা মানুষকে জাগিয়ে তোলা যায় কিন্তু যথাযথ  
পরিকল্পনা ও কাজের স্পৃহা ছাড়া যে কোনো ভালো উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রচনাটিতে লেখক  
দেশের উন্নতি ও মুক্তি এবং মানুষের কল্যাণের জন্য ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হওয়ার ওপর  
জোর দিয়েছেন।

### লেখক-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার  
আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করতে পারেননি।  
দশম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্কুল ছেড়ে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন।  
যুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়। নজরুল কলকাতায় ফিরে এসে সাহিত্যচর্চায়  
আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় সাংগৃহিক ‘বিজলী’ পত্রিকায় তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি প্রকাশিত হলে চারদিকে  
সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কবিতায় পরাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উচ্চারিত হয়েছে। অবিচার ও  
শোষণের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ করেন। এজন্য তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। তাঁর রচনাবলি

## ভাব ও কাজ

অসাম্প্রদায়িক চেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গ।

কবিতা, সংগীত, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গল্প— সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নজরুল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি সাম্যবাদী চেতনাভিত্তিক কবিতা, শ্যামাসংগীত, ইসলামি গান ও গজল লিখেছেন। কবিতা ও গানে বহুল পরিমাণে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। মাত্র তেতোলিঙ্গ বছর বয়সে তিনি কঠিন রোপে আক্রান্ত হন এবং তাঁর সাহিত্যসাধনায় ছেদ ঘটে। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে কবিকে বাংলাদেশে আনা হয়।

১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ও একুশে পদক পান। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে, কাব্যগ্রন্থ : ‘অগ্নি-বীণা’, ‘বিষের বাঁশী’, ‘সাম্যবাদী’, ‘সর্বহারা’, ‘সিঙ্গু-হিন্দোল’, ‘চক্রবাক’; উপন্যাস : ‘মৃত্যুক্ষুধা’, ‘কুহেলিকা’; গল্পগ্রন্থ : ‘ব্যথার দান’, ‘রিজের বেদন’ ‘শিউলিমালা’; প্রবন্ধগ্রন্থ : ‘যুগবাণী’, ‘রূদ্র-মঙ্গল’; নাটক : ‘ঝিলিমিলি’, ‘আলেয়া’, ‘মধুমালা’ ইত্যাদি। কাজী নজরুল ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

## কর্ম-অনুশীলন

- ক. ‘আজ্ঞার শক্তি’ বিষয়ে একটি গল্প রচনা কর (একক কাজ)।
- খ. একদল ‘ভাবে’র পক্ষে এবং আরেক দল ‘কাজে’র পক্ষ নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করবে (দলগত কাজ)।

## নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘ভাব ও কাজ’- লেখাটি কোন ধরনের সাহিত্য?

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| ক. ছোটগল্প      | খ. প্রবন্ধ |
| গ. কাহিনী কাব্য | ঘ. উপন্যাস |

২. “সে ভাবাবেশ কর্পূরের মতো উরিয়া যায়”- বাক্যটির ‘কর্পূর’ শব্দের অর্থ নিচের কোনটি?

- |  |
|--|
| ক. কপালের রেখা   |
| খ. এক ধরনের পাখি বিশেষ   |
| গ. বাতাসের সংস্পর্শে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এমন বস্তু                 |
| ঘ. বাতাসের সংস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এমন বস্তু |

৩. ‘ভাবের সুরা পান করো ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইওনা।’জ্ঞান হারালে-

- i. দেশের পতন হবে
- ii. নিজের পতন হবে
- iii. মনুষ্যত্বের পতন হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

**উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

জুয়েল ৮ম শ্রেণিতে পড়ে। সে ক্লাসে সবসময় চুপচাপ থাকে। দেখলে মনে হয় কী যেন চিন্তা করছে।  
ক্লাসের পড়াও ঠিকমত শিখেনা। কিন্তু তার স্বপ্ন এস.এস.সি পরীক্ষার পর একটি ভালো কলেজে ভর্তি হবে।

৪. ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধ অনুযায়ী জুয়েলের আচরণ হচ্ছে-

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ক. পুষ্পহীন সৌরভ | খ. সৌরভহীন পুষ্প |
| গ. বদ খেয়াল     | ঘ. লা-পরওয়া     |

৫. ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধ অনুযায়ী জুয়েলের উচিত-

- i. ভাব ও কাজের সমন্বয় করা
- ii. ভাবের উচ্ছ্঵াসকে নিয়ন্ত্রণ করা
- iii. বাস্তবধর্মী কাজে তৎপর হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

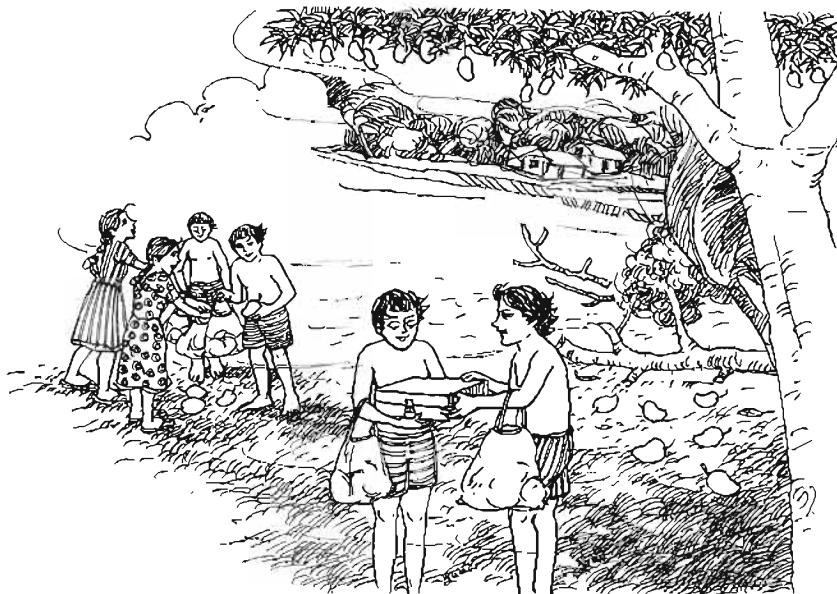
### সূজনশীল প্রশ্ন

তুমি স্বপ্নে রাজা হতে পার, কোটি কোটি টাকা, বাড়ি-গাড়ির মালিক হতে পার। কল্পলোকের সুন্দর গল্লও হতে পার, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন এক জগৎ। এখানে বড় হতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। শিক্ষার দ্বারা নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে সঠিক কর্মানুশীলনের মাধ্যমে বড় হতে হবে। সুতরাং কল্পনার জগতে হাবু-ডুরু না খেয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

- ক. যিনি ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জনসাধারণকে নাচাবেন তাকে কেমন হতে হবে?
- খ. লেখক ‘স্প্রিট’ বা আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন কেন?
- গ. উদ্দীপকটি ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধের যে দিকটি নির্দেশ করে তা বর্ণনা কর।
- ঘ. ‘কল্পনার জগতে হাবু-ডুরু না খেয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক’-  
মন্তব্যটি ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর।

# পড়ে পাওয়া

বিজ্ঞতিভূষণ বন্দেয়শাধ্যায়



কালৈশাখীর সময়টা । আমাদের ছেলেবেলার কথা ।

বিশু, সিশু, নিশু, তিশু, বাদশ এবং আরও অনেকে দুশুরের বিকট গরমের পর নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছি । বেলা বেশি নেই ।

বিশু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে বড় । সে হঠাতে কান খাড়া করে বললে - ঐ শোন -

আমরা কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করলাম । কিছু শুনতে বা বুঝতে না পেরে বললাম - কী রে ?

বিশু আমদের কথার উভয় দিলে না । তখনো কান খাড়া করে রায়েছে ।

হঠাতে আবার সে বলে উঠল - ঐ-ঐ-শোন -

আমরও এবার শুনতে পেয়েছি—দূর পশ্চিম-আকাশে ক্ষীণ গুড়গুড় মেঘের আওয়াজ ।

নিশু তাছিল্যের সঙ্গে বললে—ও কিছু না—

বিশু ধমক দিয়ে বলে উঠল—কিছু না মানে? তুই সব বুবিস কিনা? বৈশাখ মাসে পশ্চিম দিকে উরকম মেঘ ডাকার মানে তুই কিছু জানিস? বাড় উঠবে । এখন জলে নামব না । কালৈশাখী ।

আমরা সকলে ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি ও কী বলছে । কালৈশাখীর বাড় মানেই আম কুড়ানো! বাড়ুয়েদের মাঠের বাগানে চাপাতলীর আম এ অঞ্চলে বিখ্যাত । মিষ্টি কী! এই সময়ে পাকে । বাড় উঠলে তার তলায় ভিজ্বও তেমনি । যে আগে গিয়ে সৌছতে পারে তারই জয় ।

সবাই বললাম— তবে থাক ।

কিন্তু তখনো রোদ গাছপালার মাথায় দিব্যি রয়েছে । আমাদের অনেকের মনের সন্দেহ তখনো দূর হয় নি । বাড়-বাটির লক্ষণ তো কিছু দেখা যাচ্ছে না; তবে বহু দূরাগত ক্ষীণ মেঘের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে । উরই ক্ষীণ সূত্র ধরে বোকার মতো চাপাতলীর তলায় যাওয়া কি ঠিক হবে?

বিশু আমাদের সকল সংশয় দূর করে দিলে । যেমন সে চিরকাল আমাদের সকল সংশয় দূর করে এসেছে ।  
২৫ সে জানিয়ে দিলে যে, সে নিজে এখনি চাপাতলীর আমতলায় যাচ্ছে, যার ইচ্ছে হবে সে ওর সঙ্গে যেতে পারে ।

এরপর আর আমাদের সন্দেহ রইল না । আমরা সবাই ওর সঙ্গে চললাম ।

অল্পক্ষণ পরেই প্রমাণ হলো, ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ । ভীষণ বড় উঠল, কালো মেঘের রাশি উড়ে আসতে লাগল পশ্চিম থেকে । বড় বড় গাছের মাথা বাড়ের বেগে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল, ধূলোতে চারিদিক অম্বকার হয়ে গেল, একটু পরেই ঠাণ্ডা হাওয়া বইল, ফেঁটা ফেঁটা বৃক্ষ পড়তে পড়তে বড় বড় করে ভীষণ বাদলের বর্ষা নামল ।

বড় বড় আমবাগানের তলাগুলি ততক্ষণে ছেলেমেয়েতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে । আম বারছে শিলাবৃষ্টির মতো; প্রত্যেক ছেলের হাতে এক এক বোঝা আম । আমরাও যথেষ্ট আম কুড়লাম, আমের ভারে নুয়ে পড়লাম এক একজন । ভিজতে ভিজতে কেউ অন্য তলায় চলে গেল, কেউ বাড়ি চলে গেল আমের বোঝা নামিয়ে রেখে আসতে । আমি আর বাদল সন্ধ্যার অম্বকারে নদীর ধারের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছি । পথে কেউ কোথাও নেই, ছোট-বড় ডালপালা পড়ে পথ ঢেকে গিয়েছে; পাকা নোনাসুন্দ নোনাগাছের ডাল কোথা থেকে উড়ে এসে পড়েছে, কাঁটাওয়ালা সাঁহিবাবলার ডালে পথ ভর্তি, কাঁটা ফুটবার ভয়ে আমরা ডিঙিয়ে পথ চলছি আধ-অম্বকারের মধ্যে ।

এমন সময় বাদল কী একটা পায়ে বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল । আমায় বললে— দ্যাখ তো রে জিনিসটা কী? আমি হাতে তুলে দেখলাম একটি টিনের বাক্স, চাবি বস্থ । এ ধরনের টিনের বাক্সকে পাড়াগাঁা অঞ্চলে বলে, ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স । টাকাকড়ি রাখে পাড়াগাঁয়ে । এ আমরা জানি ।

বাদল হঠাৎ বড় উভেজিত হয়ে পড়ল । বললে— দেখি জিনিসটা?

- দ্যাখ তো, চিনিস?
- চিনি, ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স ।
- টাকাকড়ি থাকে ।
- তাও জানি ।
- এখন কী করবি?
- সোনার গহনাও থাকতে পারে । ভাবী দেখেছিস কেমন?
- তা তো থাকেই । টাকা গহনা আছেই এতে ।

টিনের ক্যাশ বাক্স হাতে আমরা দুজনে সেই অম্বকারে তেঁতুলতলায় বসে পড়লাম । দুজনে এখন কী করা যায় তাই ঠিক করতে হবে এখানে বসে । আম যে প্রিয় বস্তু, এত কষ্ট করে জল বড় অপ্রাহ্য করে যা কুড়িয়ে এনেছি, তাও একপাশে অনাদৃত অবস্থায় পড়েই রইল, থলেতে বা দড়ির বোনা গেঁজেতে ।

বাদল বললে— কেউ জানে না যে আমরা পেয়েছি—

- তা তো বটেই । কে জানবে আর ।
- এখন কী করা যায় বল ।
- বাক্স তো তালাবন্ধ—
- এখুনি ইট দিয়ে ভাণ্ডি যদি বলিস তো—ওঁ না জানি কত কী আছে রে এর মধ্যে । তুই আর আমি দুজনে নেব, আর কেউ না । খুব সন্দেশ থাব ।

ঝড়ের ঝাপটা আবার এলো। আমরা তেঁতুলগাছের গুঁড়িটার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তেঁতুলগাছে ভূত আছে সবাই জানে। কিন্তু ভূতের ভয় আমাদের মন থেকে চলে গিয়েছে। অন্য দিনে আমাদের দুজনের সাধ্য ছিল না এ সময় এ গাছতলায় বসে থাকি।

বাদল বলল—শীতে কেঁপে মরছি। কী করা যাবে বল। বাড়ি কিন্তু নিয়ে যাওয়া হবে না। তাহলে সবাইকে ভাগ দিতে হবে, সবাই জেনে যাবে। কী করবি?

- আমার মাথায় কিছু আসছে না রে।
- ভাঙ্গি তালা। ইট নিয়ে আসি, তুই থাক এখানে।
- না। তালা ভাঙ্গিসনে। ভাঙ্গলেই তো গেল। অন্যায় কাজ হয় তালা ভাঙ্গলে, ভেবে দ্যাখ। কোনো গরিব লোকের হয়তো। আজ তার কী কষ্ট হচ্ছে, রাতে ঘুম হচ্ছে না। তাকে ফিরিয়ে দেব বাস্তু।
- বাদল ভেবে বললে—ফেরত দিবি?
- দেব ভাবছি।
- কী করে জানবি কার বাস্তু?
- চল, সে মতলব বার করতে হবে। অধর্ম করা হবে না।

এক মুহূর্তে দুজনের মনই বদলে গেল। দুজনেই হঠাত ধার্মিক হয়ে উঠলাম। বাস্তু ফেরত দেয়ার কথা মনে আসতেই আমাদের অস্তুত পরিবর্তন হলো। বাস্তু নিয়ে জল বড়ে ভিজে সম্ম্যার পর অস্থকারে বাড়ি চলে এলাম। বাদলদের বাড়ির বিচুলিগাদায় লুকিয়ে রাখা হলো বাস্তু।

তারপর আমাদের দলের এক গৃপ্ত মিটিং বসল বাদলদের ভাঙা নাটমন্দিরের কোণে। বর্ষার দিন—আকাশ মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। জৈষ্ঠ মাসের প্রথম। সেই কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির পরই বাদলা নেমে গিয়েছে। একটা চাঁপাগাছের ফেটা চাঁপাফুল থেকে বর্ষার হাওয়ার সঙ্গে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। ব্যাঙ ডাকছে নরহরি বোঝ্টমের ডোবায়। আমাদের দলের সর্দার বিধুর নির্দেশমতো এ মিটিং বসেছিল। বাস্তু ফেরত দিতেই হবে— এ আমাদের প্রথম ও শেষ প্রস্তাব। মিটিং-এ সে প্রস্তাব পেশ করার আগেই মনে মনে আমরা সবাই সেটি মেনেই নিয়েছিলাম। বিধুকে বলা হলো বাস্তু ফেরত দেয়া সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত, অতএব এখন উপায় ঠাওরাতে হবে বাস্তুর মালিককে খুঁজে বের করার। কারও মাথায় কিছু আসে না। এ নিয়ে অনেক জল্লনা-কল্লনা হলো। যে কেউ এসে বলতে পারে বাস্তু আমার। কী করে আমরা প্রকৃত মালিককে খুঁজে বার করব? মন্তব্ধ কথা। কোনো মীমাংসাই হয় না।

অবশ্যে বিধু ভেবে ভেবে বললে—মতলব বার করিছি। ঘুড়ির মাপে কাগজ কেটে নিয়ে আয় দিকি।  
বলেছি—বিধুর হুকুম অমান্য করার সাধ্য আমাদের নেই। দু-তিনখানা কাগজ ঐ মাপে কেটে ওর সামনে হাজির করা হলো।

বিধু বললে—লেখ—বাদল লিখুক। ওর হাতের লেখা ভালো।

বাদল বলল—কী লিখব বলো—

- লেখ বড় বড় করে। বড় হাতের লেখার মতো। বুঝলি? আমি বলে দিচ্ছি—
- বলো—
- আমরা একটা বাস্তু কুড়িয়ে পেয়েছি। যার বাস্তু তিনি রায়বাড়িতে খোঁজ করুন। ইতি—বিধু, সিধু, নিধু, তিনু।
- আমি আর বাদল আপত্তি করে বললাম—বারে, আমরা কুড়িয়ে পেলাম, আর আমাদের নাম থাকবে না বুঝি?

আমাদের ভালো নাম লেখ।

বিধু বললে—লিখে দাও। ভালোই তো। ভালো নাম সবারই লেখ।

তিনখানা কাগজ লিখে নদীর ধারের রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন গাছে বেলের আঠা দিয়ে মেরে দেওয়া হলো।

দু-তিন দিন কেটে গেল।

কেউ এল না।

তিন দিন পরে একজন কালোমতো রোগা লোক আমাদের চড়ীমডপের সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তখন সেখানে বসে পড়ছি। বললাম—কী চাও?

— বাবু, ইদিরভীষণ কার নাম?

— আমার নাম। কেন? কী চাই?

— একটা বাক্স আপনারা কুড়িয়ে পেয়েছেন?

আমার নামের বিকৃত উচ্চারণ করাতে আমি চটে গিয়েছি তখন। বিরক্তিভাবে বললাম—কী রকম বাক্স?

— কাঠের বাক্স।

— না। যাও।

— বাবু, কাঠের নয়, টিনের বাক্স।

— কী রঙের টিন?

— কালো।

— না। যাও—

— বাবু দাঁড়ান, বলছি। মোর ঠিক মনে হচ্ছে না। এই রাঙা মতো—

— না, তুমি যাও।

লোকটা অপ্রতিভভাবে চলে গেল। বিধুকে খবরটা দিতে সে বললে—ওর নয় রে। লোতে পড়ে এসেছে। ওর মতো কত লোক আসবে।

আবার তিন-চার দিন কেটে গেল।

বিধুর কাছে একজন লোক এলো তারপরে। তারও বর্ণনা মিলল না; বিধু তাকে বিদায় দিলে পত্রপাঠ। যাবার সময় সে নাকি শাসিয়ে গেল, চৌকিদারকে বলবে, দেখে নেবে আমাদের ইত্যাদি। বিধু তাছিল্যের সুরে বললে— যাও যাও, যা পার করো গিয়ে। বাক্স আমরা কুড়িয়ে পাইনি। যাও।

আর কোনো লোক আসে না।

বর্ষা পড়ে গেল ভীষণ।

সেবার আমাদের নদীতে এলো ভীষণ বন্যা।

বড় বড় গাছ ভেসে যেতে দেখা গেল নদীর স্রোতে। দু-একটা গরুও আমরা দেখলাম ভেসে যেতে। অশ্বরপুর চরের কাপালিরা নিরাশ্রয় হয়ে গেল। নদীর চরে ওদের ছোট ছোট ঘরবাড়ি সেবারেও দেখে এসেছি—কী চমৎকার পটলের আবাদ, কুমড়ের খেত, লাউ-কুমড়ের মাচা ওদের চরে! দু পয়সা আয়ও পেত তরকারি বেচে। কোথায় রইল তাদের পটল-কুমড়ের আবাদ, কোথায় গেল তাদের বাড়িঘর। আমাদের ঘাটের সামনে দিয়ে কত খড়ের চালাঘর ভেসে যেতে দেখলাম। সবাই বলতে লাগল অশ্বরপুর চরের কাপালিরা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। একদিন বিকেলে আমাদের চড়ীমডপে একটা লোক এলো। বাবা বসে হাত-বাক্স সামনে

নিয়ে জমাজমির হিসেব দেখছেন। গ্রামের ভাদুই কুমোর কুয়ো কাটানোর মজুরি চাইতে এসেছে। আরও দু-একজন প্রজা এসেছে খাজনা পত্তর দিতে। আমরা দু ভাই বাবার কড়া শাসনে বহিয়ের পাতা ওলটাচ্ছি। এমন সময় একটা লোক এসে বললে—দড়বৎ হই, ঠাকুরমশায়।

বাবা বললেন—এসো। কল্যাণ হোক। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

— আজ্ঞে অস্বরপুর থেকে। আমরা কাপালি।

— বোসো। কী মনে করে? তামাক খাও। সাজো।

লোকটা তামাক সেজে থেতে লাগল। সে এসেছে এ গায়ে চাকরির খোঁজে। বন্যায় নিরাশ্রয় হয়ে নির্বিষখোলার গোয়ালাদের চালাঘরে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছে। এই বর্ষায় না আছে কাপড়, না আছে ভাত। দু আড়ি ধান ধার দিয়েছিল গোয়ালারা দয়া করে, সেও এবার ফুরিয়ে এলো। চাকরি না করলে স্ত্রী-পুত্র না থেয়ে মরবে।

বাবা বললেন—আজ এখানে দুটি ডাল-ভাত খেও।

লোকটি দীর্ঘনিশ্চাস ফেলে বললে—তা খাব। খাচ্ছিই তো আপনাদের। দুরবস্থা যখন শুরু হয় ঠাকুরমশাই, এই গত জষ্ঠি মাসে নির্বিষখোলার হাট থেকে পটল বেচে ফিরছি; ছোট মেয়েটার বিয়ে দেব বলে গহনা গড়িয়ে আনছিলাম। প্রায় আড়াই শো টাকার গহনা আর পটল-বেচা নগদ টাকা পঞ্চাশটি—একটা টিনের বাক্সের ভেতর ছিল। সেটা যে হাটের থেকে ফিরবার পথে গুরু গাড়ি থেকে কোথায় পড়ে গেল, তার আর খোঁজই হলো না। সেই হলো শুরু—আর তারপর এলো এই বন্যে—

বাবা বললেন—বল কী? অতগুলো টাকা-গহনা হারালে?

— অদেষ্ট, একেই বলে বাবু অদেষ্ট। আজ সেগুলো হাতে থাকলে—

আমি কান খাড়া করে শুনছিলাম। বলে উঠলাম—কী রঙের বাঙ্গ?

— সবুজ টিনের।

বাবা আমাদের বাক্সের ব্যাপার কিছুই জানেন না। আমায় ধর্মক দিলেন—তুমি পড়ো না, তোমার সে খোঁজে কী দরকার? কিন্তু আমি ততক্ষণে বইপত্তর ফেলে উঠে পড়েছি। একেবারে এক ছুটে বিধুর বাড়ি গিয়ে হাজির। বিধু আমার কথা শুনে বললে—দাঁড়া, সিধু আর তিনুকেও নিয়ে আসি। ওরা সাক্ষী থাকবে কি না? বিধুর খুব বুদ্ধি আমাদের মধ্যে। ও বড় হলে উকিল হবে, সবাই বলত।

আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের চড়ীমড়পের সামনে বেশ একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। বাঙ্গ ফেরত পেয়ে সে লোকটা যেন কেমন হকচকিয়ে গেল। ঢোক দিয়ে জল পড়তে লাগল। কেবল আমাদের মুখের দিকে চায় আর বলে—ঠাকুরমশাই, আপনারা মানুষ না দেবতা? গরিবের ওপর এত দয়া আপনাদের?

বিধু অত সহজে ভুলবার পাত্র নয়। সে বললে—দেখে নাও মাল সব ঠিক আছে কি না আর এই কাকাবাবুর সামনে আমাদের একটা রসিদ লিখে দাও, বুঝলে? কাকাবাবু আপনি একটু কাগজ দিন না ওকে—লিখতে জান তো?

না, ও উকিলই হবে বটে!

ফর্মা-৩, সাহিত্য কণিকা, শ্রেণি-৮ম

আমার বাবা এমন অবাক হয়ে গেলেন ব্যাপার দেখে যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না।

### শব্দার্থ ও টীকা

দিব্য	— চমৎকার   আশাতীতভাবে।
সংশয়	— সন্দেহ   দ্বিধা।
গহনা	— অলংকার।
অনাদৃত	— অবহেলিত   উপেক্ষিত   গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এমন।
বিচুলিগাদা	— ধানের খড়ের স্তূপ।
নাটমন্দির	— দেবমন্দিরে সামনের ঘর যেখানে নাচ-গান হয়।
বোষ্টম	— হরিনাম সংকীর্তন করে জীবিকা অর্জন করে এমন বৈক্ষণ।
অপ্রতিভাবে	— বিব্রত বা লজ্জিতভাবে।
পত্রপাঠ বিদায়	— তৎক্ষণাত্ম বিদায়।
চৌকিদার	— প্রহরী।
কাপালি	— তান্ত্রিক হিন্দু সম্পদায়।
চঙ্গীমণ্ডপ	— যে মণ্ডপে বা ছাদযুক্ত চতুরে দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা হয়।
দড়বৎ	— মাটিতে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রশাম।
আড়ি	— ধান, গম ইত্যাদির পরিমাপবিশেষ। ধান মাপার বেতের ঝুড়ি বা পাত্র।

### পাঠের উদ্দেশ্য

এই গল্প পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা ও নৈতিক চেতনার সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে নিজের জীবনেও এর প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে।

### পাঠ-পরিচিতি

এটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত কিশোর গল্প। এটি 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ গল্পের কিশোররা কুড়িয়ে পাওয়া অর্থ সম্পদ নিয়ে লোভের পরিচয় দেয়নি। বরং তারা তাদের বয়সের চেয়েও অনেক বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন, বয়সে ছোট হলে কী হবে তাদের নৈতিক অবস্থানও বেশ দৃঢ়। এই গল্প কিশোরদের ঐক্য চেতনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি তাদের উন্নত মানবিক বোধেরও প্রকাশ ঘটেছে। তাদের চারিত্বিক দৃঢ়তার পাশাপাশি তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিশোরদের এমন সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধে বয়োজ্যেষ্ঠরাও বিস্মিত, অভিভূত। কিশোররা যখন ঐক্যবন্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তারা তাদের

মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ও বিবেচক তাকে মান্য করে তার ওপর আস্থা স্থাপন করে। এটি গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দারিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি ভালোবাসার চিত্রও ফুটে উঠেছে এ গল্প।

### লেখক-পরিচিতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে চৰিশ পৱনা জেলার মুরাতিপুর গ্রামে, মাতুলালয়ে। তাঁর পৈতৃক বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের চৰিশ পৱনা জেলার ব্যারাকপুর গ্রামে। তাঁর বাল্য ও কৈশোরকাল কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। মাতার নাম মৃগালিনী দেবী। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেশা ছিল কথকতা ও পৌরোহিত্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়াকালে (১৯১৮) তাঁর প্রথম স্তৰীর মৃত্যু ঘটলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে। অতঃপর স্কুল শিক্ষকতাসহ নানা পেশায় তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। এর বাইশ বছর পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন (১৯৪০)। ছোটগল্প, উপন্যাস, দিনলিপি ও ভ্রমণ-কাহিনি রচনার মধ্যেই তিনি জীবনের আনন্দ খুঁজে পান। তাঁর রচিত সাহিত্যে প্রকৃতি ও মানবজীবন এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন সত্তায় সমন্বিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য ও গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনচরণের সজীব ও নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’ উপন্যাস যেমন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি তেমনি বাংলা সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : ‘আরণ্যক’, ‘ইছামতী’; গল্পগ্রন্থ : ‘মেঘমল্লার’, ‘মৌরীফুল’; ভ্রমণ-দিনলিপি : ‘তৃণাঞ্জুর’, ‘সৃতির রেখা’; কিশোর উপন্যাস : ‘চাঁদের পাহাড়’, ‘মিসমিদের কবচ’, ‘ইরামানিক জুলে’। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

### কর্ম-অনুশীলন

- ক. ভালো কাজ করলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার পক্ষে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত কর (একক কাজ)।
- খ. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের চরিত্রগুলো অবলম্বন করে একটি নাটিকা উপস্থাপন কর (দলগত কাজ)।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাদের বাগানে আম কুড়াতে কালৈশাথী উপেক্ষা করে সবাই ছুটছিল?

- |                |                |
|----------------|----------------|
| ক. চাটুয়েদের  | খ. মুখুয়েদের  |
| গ. বাড়ুয়েদের | ঘ. গাঙ্গুলিদের |

২. চাঁপাতলীর আমের ব্যাপারে এত আগ্রহের কারণ তা—

- i. প্রচুর পাওয়া যায়
- ii. খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু
- iii. নিরিষ্টে কুড়ানো যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |    |        |    |     |
|----|--------|----|-----|
| ক. | i      | খ. | ii  |
| গ. | i ও ii | ঘ. | iii |

৩. লেখকের চমৎকার অর্থে ব্যবহৃত ‘দিবিয়’ শব্দটি আমরা আর কোন অর্থে ব্যবহার করে থাকি ?

- |    |       |    |         |
|----|-------|----|---------|
| ক. | শপথ   | খ. | বিশ্বাস |
| গ. | সংশয় | ঘ. | অনবরত   |

নিচের উক্তিগুলোর উভয় দাও :

কুলের ঝাড়ুদার শচী। পরীক্ষা শেষে কক্ষ পরিষ্কার করতে গিয়ে সে একটি মূল্যবান ঘড়ি পেল। তার লোভ হলো। ভাবল, ঘড়িটা মেয়ের জামাইকে উপহার দেবে। মেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। কিন্তু রাতে ঘুমুতে গিয়ে মনে হলো—এ অন্যায়, অনুচিত। যার ঘড়ি তার মনঃকল্পের কারণে মেয়ের চরম অকল্যাণ হতে পারে। ঘড়িটা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া তার কর্তব্য। সে পরদিন তা-ই করল।

৪. শচী ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিভূ ?

- |    |      |    |      |
|----|------|----|------|
| ক. | বাদল | খ. | বিধু |
| গ. | কথক  | ঘ. | সিধু |

৫. উল্লিখিত তুলনাটা কোন মানদণ্ডে বিচার্য ? উভয়েই—

- i. ন্যায় ও কর্তব্যবোধে উদ্বৃদ্ধ
- ii. লোকলজ্জার ভয়ে ভীত
- iii. অকল্যাণ চিন্তায় তাড়িত

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |    |        |    |          |
|----|--------|----|----------|
| ক. | i      | খ. | ii       |
| গ. | i ও ii | ঘ. | ii ও iii |

## সূজনশীল প্রশ্ন

---

১. আরিফ টেক্সি ক্যাব চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একবার একজন আরোহীকে গন্তব্যে পৌছে দিয়ে সে বিশ্রাম নিছিল। সহসা গাড়ির ভিতরে দৃষ্টি পড়তে সে দেখতে পেল একটি মানিব্যাগ সিটের ওপর পড়ে আছে। ব্যাগে অনেকগুলো ডলার। কিন্তু ব্যাগে কেনো ঠিকানা পাওয়া গেল না। সে সম্ব্যায় অবধি অপেক্ষা করল। নিরূপায় হয়ে সে পত্রিকা অফিসে গিয়ে সম্পাদককে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে দেবার অনুরোধ জানায়।
  - ক. ‘পড়ে পাওয়া’ কী ধরনের রচনা ?
  - খ. ‘ওর মতো কত লোক আসবে’—বিধুর এ কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ ।
  - গ. উদ্দীপকের আরিফকে কোন যুক্তিতে বিধুদের সঙ্গে তুলনা করা যায় ?—বুঝিয়ে লেখ ।
  - ঘ. কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও আরিফ চরিত্রটি ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের মূল সুরকেই ধারণ করে আছে।—মূল্যায়ন কর।
২. সম্ব্যায় দেখা গেল, নিজেদের ছাগলের সাথে অতিরিক্ত একটি ছাগলও আঢ়ালে চুকচে। এশার নামাজ পার হয়ে গেল, কিন্তু কেউ খোঁজ নিতে এল না। দাদু বললেন, না, না, চুপ করে থাকা ঠিক হবে না। এক কাজ কর, রফিক-শফিক বেরিয়ে পড়। প্রতিবেশী নাবিল আর তালিমকে সাথে নিয়ে দুজন দুদিকে যেও। মসজিদ থেকে চোঙ্গা নিয়ে গাঁয়ে ঘোষণা দিয়ে আস। কিছুক্ষণের মধ্যে দু-ভাই দাদুর পরামর্শ মতো বলতে লাগল, ভাইসব, একটি ছাগল পাওয়া গেছে। যাদের ছাগল তারা দয়া করে মতিন শিকদারের বাড়ি থেকে নিয়ে যান।
  - ক. লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন ধরনের লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত ?
  - খ. ‘দুজনই হঠাত ধার্মিক হয়ে উঠলাম।’ কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে ?
  - গ. রফিক-শফিকের চোঙ্গা ফোকার ঘটনাটি ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কোন ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ ? ব্যাখ্যা কর।
  - ঘ. উদ্দীপকের দাদু যেন ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের মূল চেতনারই প্রতিভূ। বিশ্লেষণ কর।

# ତୈଳଚିତ୍ରେର ଭୂତ

ମାନିକ ବନ୍ଦୋପାଞ୍ଚାର



ଏକଦିନ ସକାଳ ବେଳା ପରାଶର ଡାଙ୍କାର ନିଜେର ପ୍ରକାନ୍ତ ଶାଇବ୍ରେରିତେ ବସେ ଚିଠି ଲିଖିଲେନ । ଚୋରର ଯତୋ ନିଃଶବ୍ଦେ ସରେ ଚୁକେ ନଗେନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗିଯେ ଗିଯେ ତାର ଟେବିଲ ସେଁଷେ ଦାଁଡ଼ାଳ । ପରାଶର ଡାଙ୍କାର ମୁଖ ନା ତୁଲେଇ ବଲଲେନ, 'ବୋସୋ, ନଗେନ ।'

ଚିଠିଖାନା ଶେ କରେ ଖାମେ ଭରେ ଠିକାନା ଲିଖେ ଚାକରକେ ଡେକେ ସେଟି ଡାକେ ପାଠିଯେ ଦିଯେ ତବେ ଆବାର ନଗେନେର ଦିକେ ତାକାଣେ ।

'ବସତେ ବଲାମ ଯେ? ଏ ରକମ ଚେହାରା ହେଁବେଳେ କେନ? ଅସୁଖ ନାକି?'

ନଗେନ ଥପ କରେ ଏକଟା ଚୋରର ବସେ ପଡ଼ଳ । ଚୋରକେ ଯେନ ଜିଜ୍ଞାସା କରା ହେଁବେ ସେ ଚୁରି କରେ କି ନା, ଏହିରକମ ଅଭିମାନ୍ତ୍ରାୟ ବିବ୍ରତ ହେଁବେ ସେ ବଲଲ, 'ନା ନା, ଅସୁଖ ନାହିଁ, ଅସୁଖ ଆବାର କିମେର ?'

ଗୁରୁତର କିଛୁ ଘଟେଛେ ସେ ବିଷୟେ ନିଃନେହ ହେଁ ପରାଶର ଡାଙ୍କାର ଦୁହାତେର ଆଶ୍ରମର ଡଗାଗୁଲି ଏକନ୍ତ କରେ ନଗେନକେ ଦେଖିତେ ଲାଗଲେନ । ମୋଟାସୋଟା ହାସିଥୁଣି ଛେଲେଟାର ତେଲ ଚକଚକେ ଚାମଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେନ ଶୁକିଯେ ଗେଛେ, ମୁଖେ ହାସିର ଚିହ୍ନଟକୁ ଓ ନେଇ । ଚାଉନି ଏକଟୁ ଉଦ୍‌ଭାବିତ । କଥା ବଲାର ଭଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମନ ଧାପଛାଡା ହେଁବେ ଗେଛେ ।

ନଗେନ ତାର ମାମାବାଡିତେ ଥେକେ କଲେଜେ ପଡ଼େ । ମାସ ଦୁଇ ଆଗେ ନଗେନେର ମାମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରାଖିତେ ଗିଯେ ପରାଶର ଡାଙ୍କାର ନଗେନକେ ଦେଖେଲେନ । ଏହି ଅଜ୍ଞ ସମୟେର ମଧ୍ୟେ ଏମନ କୀ ଘଟେଛେ ସାତେ ଛେଲେଟା ଏ଱କମ ବଦଳେ ଯେତେ ପାରେ? ଛେଲେବେଳା ଥେକେ ମାମାବାଡିତେଇ ସେ ମାନୁଷ ହେଁବେ ବଟେ କିମ୍ବୁ ମାମାର ଶୋକେ ଏ଱କମ କାହିଲ ହେଁ ପଡ଼ାର ଯତୋ ଆକର୍ଷଣ ତୋ ମାମାର ଜନ୍ୟ ତାର କୋଳୋ ଦିନ ଛିଲ ନା । ବଢ଼ିଲୋକ କୃପାଗ ମାମାର ସେ ଧରନେର

আদর বেচারি চিরকাল পেয়ে এসেছে তাতে মামার পরলোক যাত্রায় তার খুব বেশি দুঃখ হবার কথা নয়। বাইরে মামাকে খুব শুন্ধাভঙ্গি দেখালেও মনে মনে নগেন যে তাকে প্রায়ই যমের বাড়ি পাঠাত তাও পরাশর ডাঙ্কার ভালো করেই জানতেন। পড়ার খরচের জন্য দুষ্পিত্তা হওয়ার কারণও নগেনের নেই, কারণ শেষ সময়ে কী ভেবে তার মামা তার নামে মোটা টাকা উইল করে রেখে গেছেন।

নগেন হঠাতে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, ‘ডাঙ্কার কাকা, সত্যি করে একটা কথা বলবেন? আমি কি পাগল হয়ে গেছি?’ পরাশর ডাঙ্কার একটু হেসে বললেন, ‘তোমার মাথা হয়ে গেছে। পাগল হওয়া কি মুখের কথা রে বাবা! পাগল যে হয় অত সহজে সে টের পায় না সে পাগল হয়ে গেছে!’

‘তবে—’ দ্বিধা ভরে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাতে নগেন যেন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল, ‘আচ্ছা ডাঙ্কার কাকা, প্রেতাত্মা আছে?’

‘প্রেতাত্মা মানে তো ভূত? নেই।’

‘নেই? তবে—’

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে, অনেক ভূমিকা করে, অনেকবার শিউরে উঠে নগেন ধীরে ধীরে আসল ব্যাপারটা খুলে বলল। চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য কাহিনি। বিশ্বাস করা শক্ত হলেও পরাশর ডাঙ্কার বিশ্বাস করলেন। মিথ্যা গল্প বানিয়ে তাকে শোনাবার ছেলে যে নগেন নয়, তিনি তা জানতেন।

মামা তাকেও প্রায় নিজের ছেলেদের সমান টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন জেনে প্রথমটা নগেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মামার এরকম উদারতা সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নি। বাইরে যেমন ব্যবহারই করে থাকুন, মামা তাকে নিজের ছেলেদের মতোই ভালোবাসতেন জেনে পরলোকগত মামার জন্য আন্তরিক শুন্ধাভঙ্গিতে তার মন ভরে গেল। আর সেই সঙ্গে জাগল এরকম দেবতার মতো মানুষকে সারা জীবন ভঙ্গি-ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ। শুন্ধের দিন অনেক রাত্রে বিছানায় শুতে যাওয়ার পর অনুতাপটা যেন বেড়ে গেল—শুয়ে শুয়ে সে ছটফট করতে লাগল। হঠাতে এক সময় তার মনে হলো, সারা জীবন তো ভঙ্গি-শুন্ধার ভান করে মামাকে সে ঠকিয়েছে, এখন যদি সত্য সত্যই ভঙ্গি-শুন্ধা জেগে থাকে লাইব্রেরি ঘরে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে এলে হয়তো আত্মগ্লানি একটু কমবে, মনটা শান্ত হবে।

রাত্রি তখন প্রায় তিনিটে বেজে গেছে, সকলে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে, বাড়ি অন্ধকার। এত রাত্রে ঘুমানোর বদলে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়াটা যে রীতিমতো খাপছাড়া ব্যাপার হবে সে জ্ঞান নগেনের ছিল। তাই কাজটা সকালের জন্য স্থগিত রেখে সে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু তখন তার মাথা গরম হয়ে গেছে। মন একটু শান্ত না হলে যে ঘুম আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর সেটা ভালো করেই টের পেয়ে শেষকালে মরিয়া হয়ে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

লাইব্রেরিটি নগেনের দাদামশায়ের আমলের। লাইব্রেরি সম্পর্কে নগেনের মামার বিশেষ কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তার আমলে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে লাইব্রেরির পিছনে একটি পয়সাও খরচ করা হয়েছে কি না সন্দেহ। আলমারি কয়েকটি অল্প দামি আর অনেক দিনের পুরোনো, ভেতরগুলি বেশির ভাগ অদরকারি বাজে বইয়ে ঠাসা এবং ওপরে বহুকালের ছেঁড়া মাসিকপত্র আর নানা রকম ভাঙচোরা ঘরোয়া জিনিস গাদা করা। টেবিলটি এবং চেয়ার কয়েকটি খুব সম্ভব অন্য ঘর থেকে পেনশন পেয়ে এ ঘরে স্থান পেয়েছে। দেয়ালে

তিনটি বড় বড় তৈলচিত্র, সম্মা ক্রমে বাঁধানো কয়েকটা সাধারণ রঙিন ছবি ও ফটো টাঙানো। তা ছাড়া কয়েকটা পুরানো ক্যালেন্ডারের ছবিও আছে—কোনোটাতে ডিসেম্বর, কোনোটাতে চৈত্রমাসের বারো তারিখ লেখা কাগজের ফলক এখনো ঝুলছে।

তৈলচিত্রের একটি নগেনের দাদামশায়ের, একটি দিদিমার এবং অপরটি তার মামার। দাদামশায় আর দিদিমার তৈলচিত্র দুটি একদিকের দেয়ালে পাশাপাশি টাঙানো আছে, মামার তৈলচিত্রটি স্থান জুড়ে আছে পাশের দেয়ালের মাঝামাঝি।

কারো ঘূম ভেঙে যাবে ভয়ে নগেন আলো জ্বালে নি। কিন্তু তাতে তার কোনো অসুবিধা ছিল না, ছেলেবেলা থেকে এ বাড়ির আনাচ-কানাচের সঙ্গে তার পরিচয়। লাইব্রেরিতে চুকে অন্ধকারেই সে মামার তৈলচিত্রের কাছে এগিয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে ‘আমায় ক্ষমা করো মামা’ বলে যেই সে তৈলচিত্রের পায়ের কাছে আন্দাজে স্পর্শ করেছে—বর্ণনার এখানে পৌছে নগেন শিউরে চুপ করে গেল। তার মুখ আরও বেশি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, দুচোখ বিস্ফারিত।

#### ‘তারপর?’

নগেন ঢোক গিলে জিভ দিয়ে ঠোট চেটে বলল, ‘যেই ছবি ছুঁয়েছি ডাক্তার কাকা, কে যেন আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল। সমস্ত শরীর ঝনবান করে উঠল, তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্বান হতে দেখি, সকাল হয়ে গেছে, আমি মামার ছবির নিচে মেঝেতে পড়ে আছি।’

পরাশর ডাক্তার গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার আগে কোনো দিন ফিট হয়েছিল নগেন?’

নগেন মাথা নেড়ে বলল ‘ফিট? না, কম্বিনকালেও আমার ফিট হয় নি। আপনি ভুল করেছেন ডাক্তার কাকা, এ ফিট নয়; মরলে তো মানুষ সব জানতে পারে, মামাও জানতে পেরেছেন টাকার লোভে আমি মিথ্যা ভক্তি দেখাতাম। তাই ছবি ছোঁয়ামাত্র রাগে যেন্নায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সবটা শুনুন আগে, তা হলে বুঝতে পারবেন।’

সমস্ত সকাল নগেন মড়ার মতো বিছানায় পড়ে রইল। এই চিন্তাটাই কেবল তার মনে ঘূর্পাক খেতে লাগল, ভক্তি ভালোবাসার ছলনায় টাকা আদায় করে নিয়েছে বলে পরলোকে গিয়েও তার ওপর মামার এমন জোরালো বিত্রক্ষা জেগেছে যে তার তৈলচিত্রটি পর্যন্ত তিনি তাকে স্পর্শ করতে দিতে রাজি নন। যাই হোক, নগেন একালের ছেলে, প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর তার মনে নানারকম দ্঵িধা-সন্দেহ জাগতে লাগল। কে জানে রাত্রে যা ঘটেছে তা নিছক স্পন্দন কিনা। ধৈর্য ধরতে না পেরে দুপুরবেলা সে আবার লাইব্রেরিতে গিয়ে মামার তৈলচিত্র স্পর্শ করে প্রণাম করল। একবার যদি মামা রাগ দেখিয়ে থাকেন, আবার দেখাবেন না কেন?

এবার কিছুই ঘটল না। শরীরটা অবশ্য খুব খারাপ হয়ে আছে, মেঝেতে ধাক্কা যেখানে লেগেছিল মাথার সেখানটা ফুলে টন্টন করছে এবং সকালে লাইব্রেরিতে মামার তৈলচিত্রের নিচে মেঝেতেই তার জ্বান হয়েছিল। কিন্তু এতে বড়জোর প্রমাণ হয়, রাত্রে ঘুমের মধ্যেই হোক আর জাগ্রত অবস্থাতেই হোক লাইব্রেরিতে গিয়ে সে একটা আছাড় খেয়েছিল। নিজের তৈলচিত্রে ভর করে মামাই যে তাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন তার কী প্রমাণ আছে?

নগেন যেন স্পন্দন নিশ্চাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু বেশিক্ষণ তার মনের শাস্তি টিকল না। রাত্রে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়েই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, তার তো ভুল হয়েছে! দিনের বেলা তাকে ধাক্কা দেয়ার ক্ষমতা তো তার মামার এখন নেই, রাত্রি ছাড়া তার মামা তো এখন কিছুই করতে পারেন না! কী সর্বনাশ! তবে তো

রাত্রে আরেকবার মামার তৈলচিত্র না ছুঁয়ে কাল রাত্রের ব্যাপারকে স্ফুর বলা যায় না।

এত রাত্রে আবার লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথা ভেবেই নগেনের হৃৎকম্প হতে লাগল। কিন্তু এমন একটা সন্দেহ না মিটিয়েই বা মানুষের চলে কী করে? খানিকটা পরে নগেন আবার লাইব্রেরিতে হাজির। ভয়ে বুক কাঁপছে, ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কী এক অদম্য আকর্ষণ তাকে ঠেনে নিয়ে চলেছে মামার তৈলচিত্রের দিকে। ঘরে ঢুকেই সে সুইচ টিপে আলো জ্বলে দিল। মটকার পাঞ্জাবির ওপর দামি শাল গায়ে মামা দেয়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে একজোড়া মোটা গৌফ, ঢোকে ভর্সনার দৃষ্টি। নগেন এগিয়ে গিয়ে মামার পায়ের কাছে ছবি স্পর্শ করল। কেউ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল না, কিন্তু সমস্ত শরীর হঠাতে যেন কেমন অস্ত্রি-অস্ত্রির করতে লাগল। তৈলচিত্র থেকে কী যেন তার মধ্যে প্রবেশ করে ভেতর থেকে তাকে কাঁপিয়ে তুলছে।

তবু নগেন যেন বাঁচল। ভয়ের জন্য শরীর এরকম অস্ত্রি অস্ত্রির করতে পারে। সেটা সামান্য ব্যাপার।

ফিরে যাওয়ার সময় আলোটা নিভিয়েই নগেন আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার আরেকটা কথা মনে এসেছে। কাল ঘর অন্ধকার ছিল, আজ আলোটা থাকার জন্য যদি মামা কিছু না করে থাকেন? নগেনের ভয় অনেকটা কমে গিয়েছিল, অনেকটা নিশ্চিত মনেই সে অন্ধকারে তৈলচিত্রের কাছে ফিরে গেল। সে জানে অন্ধকারে তৈলচিত্র স্পর্শ করলেও কিছু হবে না। ঘরে একটা আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না তাতে বিশেষ কী আসে যায়? ইত্যন্ত না করেই সে সোজা তৈলচিত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। পরক্ষণে—

‘ঠিক প্রথম রাত্রের মতো জোরে ধাক্কা দিয়ে মামা আমায় ফেলে দিলেন ডাঙ্কার কাকা।’

‘অঙ্গান হয়ে গেলে?’

‘না, একেবারে অঙ্গান হয়ে যাই নি। অবশ্য আচ্ছন্নের মতো অনেকক্ষণ যেবেতে পড়েছিলাম, কিন্তু জ্ঞান ছিল। তারপর থেকে আমি ঠিক পাগলের মতো হয়ে গেছি ডাঙ্কার কাকা। দিনরাত কেবল এই কথাই ভাবি। রোজ কতবার ঠিক করি বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাব, কিন্তু যেতে পারি না, কীসে যেন আমায় জোর করে আটকে রেখেছে।’

পরাশর ডাঙ্কার খানিক্ষণ ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তারপর আর কোনোদিন ছবিটা ছুঁয়েছ?’

‘কতবার। দিনে ছুঁয়েছি, রাত্রে ছুঁয়েছি, আলো জ্বলে ছুঁয়েছি, অন্ধকারে ছুঁয়েছি। ঠিক ওইরকম ব্যাপার ঘটে। দিনে বা রাত্রে আলো জ্বলে ছুলে কিছু হয় না, অন্ধকারে ছেঁয়ামাত্র মামা আমাকে ঠেলে দেন। সমস্ত শরীর যেন ঝনঝনিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে ওঠে। কোনোদিন অঙ্গান হয়ে যাই, কোনোদিন জ্ঞান থাকে।’

বলতে বলতে নগেন যেন একেবারে ভেঙে পড়ল, ‘আমি কী করব ডাঙ্কার কাকা? এমন করে কদিন চলবে?’

পরাশর ডাঙ্কার বললেন, ‘তার দরকার হবে না। আমি সব ঠিক করে দেব। আজ সকলে ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রি ঠিক বারোটার সময় তুমি বাইরের ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, আমি যাব।’

একটু থেমে আবার বললেন, ‘ভূত বলে কিছু নেই, নগেন।’

তবু মাবারাত্রে অন্ধকার লাইব্রেরিতে পরাশর ডাঙ্কার মৃদু একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এ ঘরে বাড়ির লোক খুব কম আসে। ঘরের বাতাসে পুরোনো কাগজের একটা ভাগসা গন্ধ পাওয়া যায়। নগেন শক্ত করে তার একটা হাত ঢেপে ধরে কাঁপছে। কীসের ভয়? ভূতের? তৈলচিত্রের ভূতের? ভূতে যে একেবারে বিশ্বাস করে না, যার বন্ধুমূল ধারণা এই যে যত সব অস্ত্র অস্ত্র অথচ সত্য ভূতের গল্প শোনা যায় তার প্রত্যেকটির সাধারণ

ও স্বাভাবিক কোনো ব্যাখ্যা আছেই আছে, ছবির ভূতের অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য ভূতের ঘরে পা দিয়ে তার কখনো কি ভয় হতে পারে? তবু অস্বীকৃত যে বোধ হচ্ছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নগেন যে কাহিনি শুনিয়েছে, সারা দিন ভেবেও পরাশর ডাঙ্কার তার কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা কল্পনা করতে পারেন নি। একদিন নয়, একবার নয়, ব্যাপারটা ঘটেছে অনেকবার। দিনে তৈলচিত্র নিষ্ঠেজ হয়ে থাকে, রাত্রে তার তেজ বাড়ে। কেবল তাই নয়, অল্পকার না হলে সে তেজ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। আরও একটা কথা, রাত্রি বাড়ার সঙ্গে তৈলচিত্র যেন বেশি সজীব হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম রাত্রে নগেন অল্পকারে স্পর্শ করলে ছবি নগেনের হাতটা শুধু ছিটকিয়ে সরিয়ে দিয়েছে, মাঝরাত্রে স্পর্শ করলে এত জোরে তাকে ধাক্কা দিয়েছে যে মেঝেতে আছড়ে পড়ে নগেনের জ্বান লোপ পেয়ে গেছে।

অশৰীরী শক্তি কল্পনা করা ছাড়া এ সমস্তের আর কী মানে হয়?

হয়—নিশ্চয় হয়; মনে মনে নিজেকে ধমক দিয়ে পরাশর ডাঙ্কার নিজেকে এই কথা শুনিয়ে দিলেন। তারপর চোখ তুলে তাকালেন দেয়ালের যেখানে নগেনের মামার তৈলচিত্রটি ছিল। এ ঘরে তিনি আগেও কয়েকবার এসেছেন, তৈলচিত্রগুলির অবস্থান তার অজানা ছিল না। যা চোখে পড়ল তাতে পরাশর ডাঙ্কারের বুকটাও ধড়াস করে উঠল। তৈলচিত্রের ওপরের দিকে দুটি উজ্জ্বল চোখ তার দিকে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটির মধ্যে ফাঁক প্রায় দেড় হাত।

ঠিক এই সময় নগেন ফিসফিস করে বলল, ‘আলোটা জ্বালব ডাঙ্কার কাকা?’

পরাশর ডাঙ্কার তার গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলেন—‘না।’

রাস্তা অথবা পাশের কোনো বাড়ি থেকে সরু একটা আলোর রেখা ঘরের দেয়ালে এসে পড়েছে। তাতে অল্পকার কমে নি, মনে হচ্ছে যেন সেই আলোটুকুতে ঘরের অল্পকারটাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র।

নগেন আবার ফিসফিস করে বলল, ‘একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি ডাঙ্কার কাকা। দাদামশায় আর দিদিমার ছবি তাঁরা মরবার পর করা হয়েছিল, কিন্তু মামার ছবিটা মরবার আগে মামা নিজে শখ করে আঁকিয়েছিলেন। হয়তো সেই জন্মেই—’

নগেনের শিহরণ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। ‘ভয় পেয়ে গেছেন?’

দাঁতে দাঁত লাগিয়ে পরাশর ডাঙ্কার তৈলচিত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি যেতে জ্বলজ্বলে চোখ দুটির জ্যোতি যেন অনেক কমে গেল। হাত বাড়িয়ে দিতে প্রথমে তার হাত পড়ল দেয়ালে। যত সাহস করেই এগিয়ে এসে থাকুন, প্রথমেই একেবারে নগেনের মামার গায়ে হাত দিতে তার কেমন দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। পাশের দিকে হাত সরিয়ে তৈলচিত্রের ফ্রেম স্পর্শ করা মাত্র বৈদ্যুতিক আঘাতে যেন তার শরীরটা ঝনঝন করে উঠল। অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ করে পেছন দিকে দু পা ছিটকে দিয়ে তিনি মেঝেতে বসে পড়লেন।

পরক্ষণে ভয়ে অর্ধমৃত নগেন আলোর সুইচ টিপে দিল।

মিনিট পাঁচেক পরাশর ডাঙ্কার চোখ বুঁজে বসে রইলেন, তারপর চোখ মেলে মিনিট পাঁচেক একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নগেনের মামার বুপার ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রটির দিকে।

তারপর তীব্র চাপা গলায় তিনি বললেন, ‘তুমি একটি আস্ত গর্দভ নগেন।’

রাগ একটু কমলে পরাশর ডাক্তার বলতে লাগলেন, ‘গাধাও তোমার চেয়ে বৃদ্ধিমান। এত কথা বলতে পারলে আমাকে আর এই কথাটা একবার বলতে পারলে না যে তোমার মামার ছবিটা ইতিমধ্যে রূপার ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে আর ছবির সঙ্গে লাগিয়ে দুটো ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট করা হয়েছে?’

‘আমি কি জানি! ছ মাস আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম ছবিটা এখানে তেমনি অবস্থাতেই আছে।’

‘ইলেকট্রিক শক খেয়ে বুঝতে পারো না কীসে শক লাগল, তুমি কোনদেশি ছেলে? আমি তো শক খাওয়া মাত্র টের পেয়ে গিয়েছিলাম তোমার মামার ছবিতে কোনো প্রতাত্তা ভর করেছেন।’

নগেন উদ্ভান্তের মতো বলল, ‘রূপার ফ্রেমটা দাদামশায়ের ছবিতে ছিল, চুরি ঘাবার ভয়ে মামা অনেক দিন আগে সিন্দুকে তুলে রেখেছিলেন। মামার শ্রাদ্ধের দিন মামিমা ফ্রেমটা বার করে মামার ছবিটা বাঁধিয়েছিলেন। আলো দুটো লাগিয়েছে আমার মামাতো ভাই পরেশ।’

‘হ্যাঁ। সে এ বছর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাই বলল, এই সামান্য কাজের জন্য ইলেকট্রিক মিঞ্চিকে পয়সা দেব কেন?’

পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, ‘পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে। কিছু পয়সা বাঁচানোর জন্য বাপের ছবিতে ভূত এনে ছেড়েছে। এ খবরটা যদি আগে দিতে আমায় —’

নগেন সংশয়ভরে বলল, ‘কিন্তু ডাক্তার কাকা —’

পরাশর ডাক্তার রাগ করে বললেন, ‘কিন্তু কী? এখনো বুঝতে পারছ না। দিনের বেলা মেন সুইচ অফ করা থাকে, তাই ছবি ছুঁলে কিছু হয় না, ছবি মানে ছবির রূপার ফ্রেমটা। রূপার ফ্রেমটার নিচে কাঠফাট কিছু আছে, দেয়ালের সঙ্গে যোগ নেই, নইলে তোমাদের ইলেকট্রিকের বিল এমন হুচু করে বেড়ে যেত যে আবার কোম্পানির লোককে এসে লিকেজ খুঁজতে হতো। তুমিও আবার ভূতের আসল পরিচয়টা জানতে পারতে। সম্ম্যার পর বাড়ির সমস্ত আলো জ্বলে আর বিদ্যুৎ তামার তার দিয়ে যাতায়াত করতে বেশি ভালোবাসে কিনা, তাই সে সময় ছবি ছুঁলে তোমার কিছু হয় না। এ ঘরের আলোটা জ্বাললেও তাই হয়। মাঝরাত্রে বাড়ির সমস্ত আলো নিতে যায়, তখন ছবিটা ছুঁলে আর কোনো পথ খোলা নেই দেখে বিদ্যুৎ অগত্যা তোমার মতো বোকা হাবার শরীরটা দিয়েই —’

পরাশর ডাক্তার চুপ করে গেলেন। তার হঠাত মনে পড়ে গেছে, সুযোগ পেলে তার শরীরটা পথ হিসেবে ব্যবহার করতেও বিদ্যুৎ দিখা করে না। তিনি হাঁফ ছাঢ়লেন। কপাল ভালো তড়িতাত্ত্ব হয়ে প্রাণে মরতে হয় নি।

### শব্দার্থ ও টীকা

- 
- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| প্রকাণ্ড | — অত্যন্ত বৃহৎ, অতিশয় বড়।         |
| বিব্রত   | — ব্যতিব্যন্ত, বিপন্ন, বিচলিত।      |
| উদ্ভান্ত | — বিহুল, দিশেহারা, হতজ্ঞান।         |
| খাপছাড়া | — বেমানান, উক্তট, অসংলগ্ন, এলোমেলো। |

শ্রাদ্ধ	— মৃত ব্যক্তির আত্মার শাস্তির জন্য শ্রাদ্ধা নিবেদনের হিন্দু আচার বা শাক্তীয় অনুষ্ঠান।
উইল	— শেষ ইচ্ছপত্র। মৃত্যুর পরে সম্পত্তি বর্ণন বিষয়ে মালিকের ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত ব্যবস্থাপত্র বা দানপত্র, যা তার মৃত্যুর পরে ব্যবহৃত হয়।
প্রেতাভা	— মৃতের আত্মা, ভূত।
অনুত্তাপ	— আফসোস, কৃতকর্ম বা আচরণের জন্য অনুশোচনা, পরিতাপ।
তেলচিত্র	— তেলরঙে আঁকা ছবি।
প্রগাম	— হাত ও মাথা দ্বারা গুরুজনের চরণ স্পর্শ করে অভিবাদন।
আত্মগ্লানি	— নিজের ওপর ক্ষেত্র ও ধিক্কার, অনুত্তাপ, অনুশোচনা।
বিস্ফারিত	— বিস্তারিত, প্রসারিত।
কস্মিনকালে	— কোনো কালে বা কোনো কালেই।
ছলনা	— কপটতা, শর্তা, প্রতারণা, প্রবৰ্থনা, খোঁকা।
হৎকচ্চ	— হৎপিডের স্পন্দন, বুকের কাঁপুনি।
মটকা	— রেশমের মোটা কাপড়।
ভর্তসনা	— তিরক্ষার, ধৰ্মক, নিন্দা।
ইতস্তত	— দ্বিধা, সংকোচ, গড়িমসি।
অশৱীরী	— দেহহীন, শরীরহীন, নিরাকার।

### পাঠের উচ্চেশ্য

ভূতে বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে যে কুসংস্কার বিরাজমান, তা ভিত্তিহীন, কাঙ্গালিক ও অন্তঃসারশূন্য। বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে এই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সহজেই দূর করা সম্ভব। গল্পটি পড়ে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে ভয়মুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত ও সচেতন হবে।

### পাঠ-পরিচিতি

‘তেলচিত্রের ভূত’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি কিশোর-উপায়োগী ছোটগল্প। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘মৌচাক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এ গল্পটি। ভূতে বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে বিরাজমান কুসংস্কার যে ভিত্তিহীন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে তা তুলে ধরেছেন। এ গল্পে তিনি দেখিয়েছেন বিজ্ঞানবুদ্ধির জয়। কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে মানুষ নানা অশৱীরী শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষকে যদি বিজ্ঞানচেতনা দিয়ে ঘটনা-বিশ্লেষণে উদ্বৃদ্ধ করা যায় তাহলে ঐসব বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে নগেন চারিত্রের মধ্যে ভূত-বিশ্বাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে পরাশর ডাক্তার বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন নগেনের বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভিত্তিহীনতাকে। মৃত ব্যক্তির আত্মা ভূতে পরিগত হয়— এরকম বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত থাকায় নগেন বৈদ্যুতিক শক্তিকে ভূতের কাজ বলে সহজে বিশ্বাস করেছে। অন্যদিকে পরাশর ডাক্তার সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করেন বলে তার কাছে বৈদ্যুতিক শক্তিকে বিষয়টি সহজেই ধরা পড়েছে।

ଲେଖକ-ପରିଚ୍ୟ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘মানিক’ তাঁর ডাকনাম। ১৯০৮ সালে সাওতাল পরগনার দুমকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ঢাকার বিক্রমপুরে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৯২৮ সালে তাঁর প্রথম গল্প ছাপা হয়। লেখালেখির কারণে বি. এসসি পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন নি। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘পদ্মানন্দীর মাঝি’ অবলম্বনে চলচিত্র নির্মিত হয়েছে। এই উপন্যাসে তিনি জেলদের কথা বলতে গিয়ে শোষক ও শোষিত দুই শ্রেণির চিত্র এঁকেছেন। এছাড়া ‘দিবারাঞ্জির কাব্য’, ‘অহিংসা’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’, তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তাঁর লেখার প্রবণতা ছিল মানুষের মন-বিশ্লেষণ করা। ১৯৫৬ সালে তিনি কলকাতায় মারা যান।

କର୍ମ-ଅନୁଶୀଳନ

- ক. ৪০০ শব্দের মধ্যে মজা পাওয়ার মতো একটি ভূতের গল্প লেখ (একক কাজ)।  
খ. আমাদের সমাজে ভূত ছাড়াও অন্য কী কী কুসংস্কর আছে—সেগুলোর তালিকা করে টীকা লেখ (একক কাজ)।  
(যাত্রার সময় হাঁচি, যাত্রার সময় পেছন থেকে ডাকা, এক শালিক দেখা, খালি কলস দেখা, কাক ডাকা ইত্যাদি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক যন্ত্র উপস্থাপন)

ନୟନୀ ପତ୍ର

বঙ্গনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশংসনোৱা উভয় দাও :

ଆଦନାନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ହାସପାତାଲ ଥିକେ ବାଡ଼ି ଫିରଛିଲ । ଏକ ସମୟ ମନେ ହଲୋ ତାର ପେଛନେ ପେଛନେ କେଉ ହିଁଟିଛେ । ମେ ପେଛନେ ଫିରେ ତାକାଯ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିତେ ପାଯ ନା । ଫଳେ ମେ ଭୟେ କାପଛିଲ । ଏମନ ସମୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଚଲେ ଗେଲେ ମେ ଜୋରେ ଚିଂକାର ଦିଯେ ଓଠେ । ତାର ମା ବାତି ନିଯେ ଛୁଟେ ଏସେ ଦେଖିନ ଆଦନାନେର ପାଯେର ଜୁତାର ତଳେ ପେରେକ ଗୀଥା ଏକଟା କାଠି । ଏତକ୍ଷଣେ ଆଦନାନ ଭୟେର କାରଣ ଖୁଜେ ପାଯ ।

৪. উদ্দীপকের আদনান-এর সাথে 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের সাদৃশ্যের কারণ—

- ক. তাদের বয়স কম খ. তারা অন্ধকারকে ভয় করত



- #### ৫. এরপ সাদৃশ্যের মূলে কোনটি বিদ্যমান?

- ## ক. বাস্তবজ্ঞানের অভাব ও প্রকৃত শিক্ষা না পাওয়া

- গ. মানসিক বিকাশ না হওয়া      ঘ. সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারা

সুজনশীল প্রশ্ন

ରଫିକ ସାହେବ ଶୀତେର ଛୁଟିତେ ଭାଗି ସାହାନାକେ ନିଯେ ପ୍ରାମେ ବେଡ଼ାତେ ଯାନ । ରାତର ଆକାଶ ଦେଖାର ଜନ୍ୟ ତାର ଖୋଲା ମାଠେ ଯାନ । ଅଦୁରେଇ ଦେଖିତେ ପାନ ମାଠେର ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଲୋ ଝୁଲେ ଉଠେ ତା ସାମନେ ଏଗିଯେ ଯାଚେ । ଓଟା କିସେର ଆଲୋ ତା ଜାନିତେ ଚାଇଲେ ସାହାନାର ମାମା ବଲେନ, ଭୂତେର! ସାହାନା ଡଯ ପେଯେ ତାର ମାମାକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ । ମାମା ତଥନ ତାକେ ବୁଝିଯେ ବଲେନ ଯେ, ଖୋଲା ମାଠେର ମାଟିତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ ଥାକେ – ଯା ବାତାସେର ସଂପର୍କେ ଏଲେ ଝୁଲେ ଓଠେ । ସାହାନା ବିଷୟଟା ବୁଝିତେ ପେରେ ସାଭାବିକ ହୟ ।

- ক. 'তেলচিত্রের ভূত' কোন জাতীয় রচনা ?

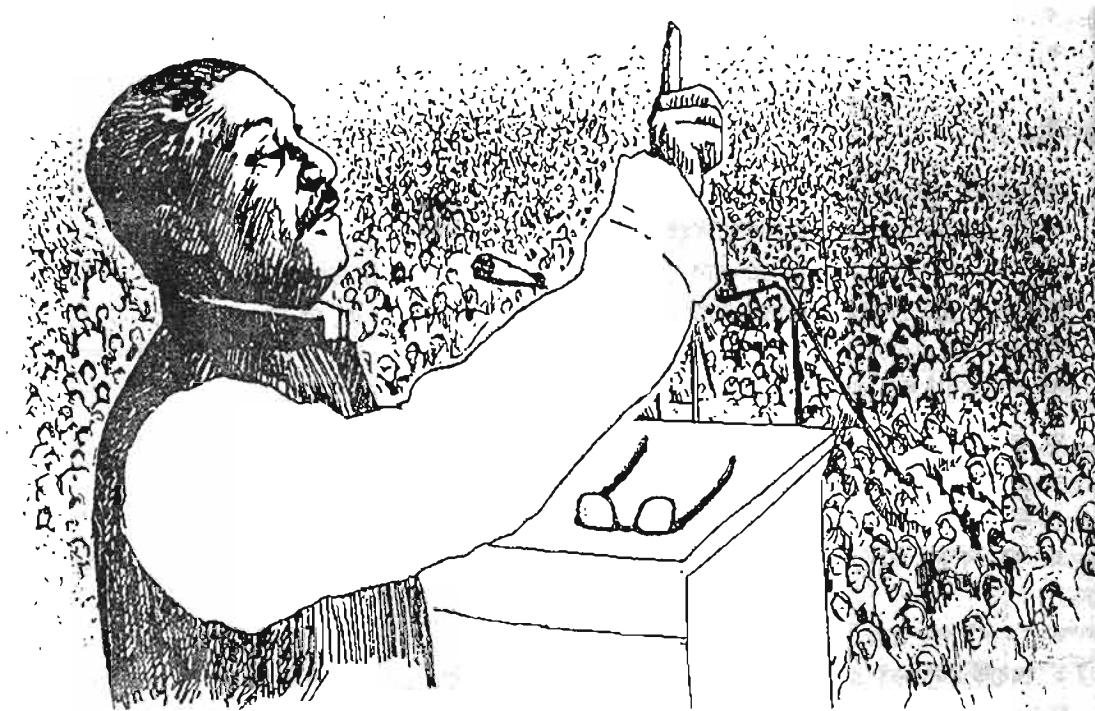
খ. পরাশর ডাক্তার নগেনকে ভর্তসনা করলেন কেন ?

গ. উদ্দীপকের সাহানা আর 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের বিশেষ মিল কোথায় ?—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "রফিক সাহেব আর 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাক্তার উভয়কে আধুনিক মানসিকতার অধিকারী বলা যায় ?" — উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

# এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতাৱ সংগ্রাম

শেখ মুজিবুৰ রহমান



[পূৰ্বকথা : ১৯৬৯-এৱে গণঅভ্যুত্থানেৱে প্ৰেক্ষাপটে পাকিস্তানেৱে সামৰিক একনায়ক আইন্দ্ৰিয়াৰ খান ক্ষমতাচ্যুত হন। এৱেপৰি ক্ষমতায় এসে নতুন প্ৰেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সাধাৱণ নিৰ্বাচন দিতে বাধ্য হন। নিৰ্বাচনে আওয়ামী জীগ একক সংখ্যাগৱাচ্ছিতা লাভ কৰে। গণতন্ত্ৰেৱ ধাৰা অনুসৰে পাকিস্তানেৱ শাসনভাৱে পাওয়াৱ কথা আওয়ামী জীগেৱ অৰ্থাৎ বাঙালিৱ অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুৰ রহমানেৱ। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদেৱ হাতে ক্ষমতা হস্তান্তৰ না কৰাৱ ও গণতন্ত্ৰ হত্যাৱ বড়্যতন্ত্ৰে লিঙ্গ হয়। প্ৰেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালেৱ ওৱা মাৰ্চ ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পৰিষদেৱ প্ৰথম অধিবেশন ঢাকেন। কিন্তু কোনো কাৱণ ছাড়াই তিনি হঠাৎ ১লা মাৰ্চ জাতীয় পৰিষদেৱ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা কৰেন। এই বড়্যতন্ত্ৰমূলক ঘোষণা শুনেই পূৰ্ব বাংলাৰ সৰ্বত্র প্ৰতিবাদ ও বিক্ষোভেৱ বাড় ওঠে। ‘জয় বাংলা’, ‘বীৱি বাঙালি অস্তি ধৰ বাংলাদেশ স্বাধীন কৰ’, ‘তোমাৰ আমাৰ ঠিকানা পঞ্চা মেঘনা যমুনা’, ‘জাগো জাগো বাঙালি জাগো’ ইত্যাদি ঝোগানে শহুৱ-বন্দৱ-গ্ৰাম আন্দোলিত হয়।

এই পটভূমিতেই ১৯৭১-এৱে ৭ই মাৰ্চ ঢাকাৰ রেসকোৰ্স মন্দিৰানে (বৰ্তমান সোহৱাওয়ার্দি উদ্যান) প্ৰায় ১০ লক্ষ লোকেৱ উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুৰ রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ১৮ মিনিটেৱ ওই ভাষণে তিনি বাঙালিৱ মুক্তি না হওয়া পৰ্যন্ত স্বাধীনতাৱ সংগ্ৰামেৱ আহৰণ জানান। আবেগে, বক্তব্যে, দিক-নিৰ্দেশনায় এটি পৃথিবীৱ শ্ৰেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃত। ২০১৭ সালেৱ ৩০শে অক্টোবৰ ইউনেছো এই ভাষণটিকে ‘ইণ্টাৱন্যাশনাল মেমোৰি অব দ্য ওয়াৰ্ল্ড’ ৱেজিস্টাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে।]

### ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ-ভারক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, ঢট্টাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতি, রাজনৈতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমুক্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল'জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন—গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব—এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম—আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাব। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখ্য হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবন্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরন্তর মানুষের বিরুদ্ধে—তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, ১০  
আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের

উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মাঝের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসবো? হঠাতে আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

**ভাইয়েরা আমার,**

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহিদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন, ‘মার্শল ল’ withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রী চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবিদ্যুতকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লক্ষণ চলবে—শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াগদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো—কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে—নিজেদের মধ্যে আতঙ্কলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়— হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপ্ট্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে

দেয়ানেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাংলিরা বুঝেসুবো কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

### শব্দার্থ ও টীকা

(তথ্যসূত্র : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান)

নির্বাচনের পর	— ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।
ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি	— জাতীয় পরিষদ।
শাসনতন্ত্র	— রাষ্ট্র পরিচালনার অনুশাসন ও বিধানসমূহ, সংবিধান।
ভুট্টো সাহেব	— পাকিস্তান পিপলস് পার্টির তৎকালীন নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি পাকিস্তানি সামরিক সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলি যেন পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় যেতে না পারে সে জন্যে হীন ঘৃঢ়যন্ত্রে লিপ্ত হন।
আরটিসি	— রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স। গোল টেবিল বৈঠক। সমস্যা সমাধানের কথা বলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রকাশ্যে গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করলেও তেতরে তেতরে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিতে থাকেন।
মার্শাল ল	— সামরিক আইন। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়া নস্যাং করার জন্য ১৯৫৮ সাল থেকে সামরিক শাসন চালু রাখা হয়।
withdraw	— প্রত্যাহার।
ব্যারাক	— সেনান্বাড়ি।
সেক্রেটারিয়েট	— রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশাসনিক কেন্দ্র। সচিবালয়।
সুপ্রিমকোর্ট	— সর্বোচ্চ আদালত।
হাইকোর্ট	— উচ্চ আদালত।
জজকোর্ট	— জেলা আদালত।
সেমি-গৰ্ভনমেন্ট	— আধা-সরকারি।
ওয়াপদা	— ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
UNESCO	— জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা। এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে।

### পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী রচনাটি পাঠ করলে স্বাধীন বাংলি জাতি ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বজ্জবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রাম, অবদান এবং বাংলি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর

নিরবচ্ছিন্ন সাধনার কথা জানতে পারবে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বৃদ্ধ হবে।

### পাঠ-পরিচিতি

পাকিস্তানি উপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে বাঙালির সার্বিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে কারাবরণ করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অর্জন করে নিরজ্ঞুল বিজয়। তবুও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলায় সর্বান্তক অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) প্রায় দশ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ মিনিটের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ইউনেস্কো এই ভাষণটিকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য গৌরবের। এই ভাষণ ৭ই মার্চের ভাষণ হিসেবে বিখ্যাত। এই ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল উজ্জীবন ও ভাবাবেগ তৈরি করে দেন।

### লেখক-পরিচিতি

হাজার বছরের প্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি। তিনি আমাদের জাতির পিতা। তাঁর জন্ম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়েরা খাতুন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতি ও দেশব্রতে যুক্ত হন। ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনায় তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি বাঙালির স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি ৬ দফা আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাকালে ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পরে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতাকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধ পরিচালনা করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী দেশে ফেরেন। এরপর যুদ্ধবিধিস্ত দেশ গড়ার মহান দায়িত্বে ব্রতী হন। তাঁর সরকারই স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করে (১৯৭২)। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তিনি প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে বাংলাকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর কতিপয় ঘৃণ্য ও ক্ষমতালোভী সদস্য ইতিহাসের জগন্য অপরাধ সংঘটিত করে। তারা একান্তরের পরাজিত শক্তির দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চত্রান্তকারীদের সঙ্গে মিলে পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে।

### কর্ম-অনুশীলন

- ক. বাঙালিদের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন কোন আন্দোলনে কী জাতীয় ভূমিকা রেখেছেন, সে সম্পর্কে একটি রচনা লেখ (একক কাজ)।
- খ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশপ্রেম ইত্যাদি অবলম্বনে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটকী, ছবি ইত্যাদি রচনা করে দেয়ালিকা প্রকাশ কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।

গ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—এ বিষয় অবলম্বনে পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (একক কাজ, প্রত্যেকের পোস্টারে শ্রেণি ও শিক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর লিখতে হবে)।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

---

১. কত তারিখে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন ?

ক. ১৯৬৯-এর ৭ই মার্চ      খ. ১৯৭১-এর ৩০ মার্চ

গ. ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ      ঘ. ১৯৭৪-এর ৩০ মার্চ

২. রেসকোর্স ময়দানের ভাষণই বাংলাদেশের স্বাধীনতার আহ্বান। কেননা এই ভাষণ—

ক. আজও স্বাধীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়

খ. সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার অঙ্গীকার

গ. অ্যাসেম্বলিতে না বসার আহ্বান

ঘ. বাঙালির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামের আহ্বান

৩. আইয়ুব খানের পতনের পর কে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিশুতি দিয়েছিলেন ?

ক. শেখ মুজিবুর রহমান      খ. ইয়াহিয়া খান

গ. মওলানা ভাসানী      ঘ. জুলফিকার আলী ভুট্টো

#### নিচের উন্নিপক্টি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেল, জুলুম, নির্যাতনের শিকার হন। নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী তাঁর জীবন থেকে কেড়ে নেয় ২৭টি বছর। কিন্তু তিনি কখনও মাথা নত করেন নি। অবশেষে জয় হয় মানবতার, অবসান ঘটে বর্ণবাদের।

৪। বঙ্গবন্ধু ও নেলসন ম্যান্ডেলা এর মধ্যে যে গুণের মিল পাওয়া যায় তা হচ্ছে—

i. সহনশীলতা

ii. দেশপ্রেম

## iii. আপসহীনতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৫. বঙ্গবন্ধুর এই বিশেষ গুণ আমাদের উপর দিয়েছে—

ক. গভীর দেশপ্রেম

খ. বাঙালি সংস্কৃতি

গ. স্বাধীন রাষ্ট্র

ঘ. বৈষম্য থেকে মুক্তি

**সূজনশীল প্রশ্ন**

অহিংসার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতন্ত্র — যেখানে সবাই সমান স্বাধীনতা থাকে। যেখানে প্রত্যেকেই হবে তার জগৎ-নিয়ন্তা। এটাই সেই গণতন্ত্র যাতে আপনাদের আজ অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। একদিন আপনারা বুঝতে পারবেন, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য ভুলে যাওয়া এবং আপনারা আপনাদের শুধু মানুষ মনে করবেন, এবং সবাই একত্র হয়ে স্বাধীনতার আদোলনে ব্রতী হবেন।

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম কত তারিখে ?

খ. ‘বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস’—বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

গ. উদ্দীপকে মহাত্মা গান্ধীর ভাষণে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’— ভাষণটির সম্পূর্ণভাব ধারণ করে— মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।



ଖାଦ୍ୟଶ୍ରେଣୀର ପରେଇ ବାଂଲାଦେଶେର ମାନୁଷେର ଜୀବନେର ସଜ୍ଜେ ଯେ ଜିନିସଟି ଅତି ନିବିଡ଼ଭାବେ ଜଡ଼ିଯେ ଆଛେ, ତା ହଲୋ ଏଖାନକାର କୁଟିରଶିଳ୍ପ । ଏକ ସମୟେ ଘର-ଗୃହଶାଳିର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରେର ଥାଇ ସବ ପଣ୍ଡିତ ଏଦେଶେର ପ୍ରାମେର କୁଟିରେ ତୈରି ହତୋ । ଆଜି ଅନେକ କିଛି ହେଁ । ଏଗୁଳୋ କୁଟିରଶିଳ୍ପର ଯାଧ୍ୟମେ ତୈରି ହଲେଓ ଶିଳ୍ପୁଣ୍ଡ ବିଚାରେ ଏ ଧରନେର ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟେ ଗଣ୍ଯ ।

ଆମାଦେର ଦେଶେର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଶିଳ୍ପର କତକୁଳୋ ଏକ ସମୟେ ଏମନ ଉଚ୍ଚମାନେର ଛିଲ ଯେ, ଆଜି ଆମରା ଦେଶର ଜିନିସର କଥା ଅରଣ କରେ ଗର୍ବବୋଧ କରି ।

ପ୍ରଥମେ ବଲତେ ହେଁ ଢାକାଇ ମସଲିନେର କଥା । ଢାକା ଶହରେର ଅନ୍ଦୁରେ ଡେମରା ଏଲାକାର ତାତିଦେର ଏ ଅମୂଳ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏକକାଳେ ଦୁନିଆ ଜୁଡ଼େ ତୁଳେଛିଲ ପ୍ରବଳ ଆଲୋଡ଼ନ । ଢାକାର ମସଲିନ ତତ୍କାଳୀନ ଯୋଗତ ବାଦଶାହଦେର ବିଲାସେର ବନ୍ଧୁ ଛିଲ । ମସଲିନ କାଗଢ଼ ଏତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁତା ଦିଯେ ବୋନା ହତୋ ଯେ, ଛୋଟ ଏକଟି ଆଂଟିର ଭିତର ଦିଯେ ଅନ୍ୟାୟେ କମ୍ବେକଣ ଗଜ ମସଲିନ କାଗଢ଼ ପ୍ରବେଶ କରିଯେ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ଛିଲ । ଶୁଦ୍ଧ କାରିଗରି ଦର୍ଶକତାଯ ନାହିଁ, ଏ ଧରନେର କାଗଢ଼ ବୁନବାର ଜନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ମନ ଧାକାଓ ପ୍ରମୋଜନ । ଆଜ ସେଇ ମସଲିନ ନେଇ । ତବେ ମସଲିନ ସାରା ବୁନତ, ତାଦେର ବଞ୍ଚିଧରରା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରେ ଏ ଶିଳ୍ପିଙ୍କ ବହନ କରେ ଆସିବେ ବଲେ ଜାମଦାନି ଶାଢ଼ି ଆମରା ଆଜି ଦେଖିବେ ପାଇ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗେ ଜାମଦାନି ଶାଢ଼ି ଦେଶେ-ବିଦେଶେ ଶୁଦ୍ଧ ପରିଚିତିହୀ ନାହିଁ, ଗର୍ବେର ବସ୍ତୁ ।

ଏମନି ଆର ଏକଟି ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକଶିଳ୍ପ ଆଜ ଲୁଞ୍ଜାଯାଇ ହଲେଓ କିଛି କିଛି ନମ୍ବନା ପାଉନା ଯାଇ । ଏଟି ହଲୋ ନକଶିକ୍ଷାଧା । ଏକ ସମୟ ବାଂଲାଦେଶେର ପ୍ରାମେ ପ୍ରାମେ ଏ ନକଶିକ୍ଷାଧା ତୈରିର ବ୍ୟୋମାଜ ଛିଲ । ଏକ ଏକଟି ସାଧାରଣ ଆକାରେର ନକଶିକ୍ଷାଧା ମେଲାଇ କରିତେବେ କମପକ୍ଷେ ହେଁ ମାସ ଲାଗିବାକାଲେ ସଖନ ଚାରଦିକେ ପାନି ଧୈ ଧୈ କରେ, ସର ଥେକେ ବାଇରେ ବେରି

হওয়া যায় না, এমন মৌসুমই ছিল নকশিকাঁথা সেলাইয়ের উপযুক্ত সময়। মেয়েরা সৎসারের কাজ সাজা করে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে পাটি বিছিরে পানের বাটাটি পাশে নিয়ে পা মেলে বসতেন এ বিচির নকশা তোলা কাঁথা সেলাই করতে। পড়শিরাও সুযোগ পেলে আসত গজ করতে। আপন পরিবেশ থেকেই মেয়েরা তাঁদের মনের মতো করে কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন। এমনি এক একটি কাঁথা সেলাই কত গজ, কত হাসি, কত কানুর মধ্যে দিয়ে শেষ হতো তা বলা যায় না। শুধু কতকগুলো সুজ সেলাই আর ঝং-বেরঙের নকশার জন্যই নকশিকাঁথা বলা হয় না বরং কাঁথার প্রতিটি সুচের ফোড়ের মধ্যে শুকিয়ে আছে এক-একটি পরিবারের কাহিনি, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাথা।

আমাদের দেশের লোকশিল্প বিভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁতশিল্প বাংলাদেশের সব এলাকাতেই আছে; তবে ঢাকা, টাঙ্গাইল, শাহজাদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এলাকায় তাঁতশিল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

জামদানি শাড়ির কথা আমরা আলোচনা করেছি। নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামেই জামদানি কারিগরদের বসবাস। শতাব্দীকাল ধরে এ তাঁতশিল্প বিভাগ জাত করেছে শীতলক্ষ্য নদীর তীরবর্তী এ এলাকায়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ শীতলক্ষ্য নদীর পানির বাস্প থেকে যে আর্দ্রতার সূচিত হয় তা জামদানি বোনার জন্য শুধু উপযোগীই নয়, বরং এক অপরিহার্য বস্তু বলা চলে। তৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া এবং পরিস্থিতির জন্য শুধু অতীতের তাঁতদের তাঁতশিল্পই নয়, বর্তমানের বড় বড় কাপড়ের কারখানাও শীতলক্ষ্য নদীর তীরে গড়ে উঠেছে।

কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে প্রস্তুত খাদি বা খদ্দরের সমাদর শুধু গ্রামজীবনেই নয়, শহরের আধুনিক সমাজেও যথেষ্ট রয়েছে। খাদি কাপড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে, এর সবটাই হাতে প্রস্তুত। তুলা থেকে হাতে সূতা কাটা হয়। গ্রামবাসীরা অবসর সময়ে সূতা কাটে। এদের বলা হয় কাটুনি। গ্রামে বাড়ির আশেপাশে তুলার গাছ লাগানোর রীতি আছে। সেই গাছের তুলা দিয়ে সূতা কাটা ও হস্ত চালিত তাঁতে এসব সূতায় যে কাপড় প্রস্তুত করা হয়, সেই কাপড়ই প্রকৃত খাদি বা খদ্দর। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বিদেশি কাপড় বর্জন করে দেশি কাপড় ব্যবহারের যে আদর্শ প্রবর্তিত হয়েছিল তারই সাফল্যের স্বাক্ষর এই খাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, বান্দরবান, ব্রামগড় এলাকার চাকমা, কুকি ও মুরং মেয়েরা এবং সিলেটের মাছিমপুর অঞ্চলের মণিপুরি মেয়েরা তাদের নিজেদের ও পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র বুনে থাকে। এ কাপড়গুলো সাধারণত মোটা ও টেকসই হয়। নকশা, রং ও বুনন কৌশল সবই তাদের নিজের ঐতিহ্য অনুযায়ী হয়।



বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কাঁসা ও পিতলের বাসনগতি এককালে বেশ প্রচলিত ছিল। আজও শত শত গ্রাম কারিগর তৈরি করে বিচির ধরনের তৈজসপত্র। প্রথমে মাটির ছাঁচ করে তার মধ্যে ঢেলে দেয় গলিত কাঁসা। ধীরে ধীরে এ গলিত খাতু ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তখন শুপর থেকে মাটির ছাঁচটি ভেঙে ফেললেই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বদনা, বাটি, ঘাস, থালা ইত্যাদি। তারপর এগুলো পালিশ করা হয়। এ ধরনের বাসনে নানারকম ফুল পাতার নকশা বা ফরমাশকারীর নাম খোদাই করা থাকে। এমনকি আজকাল অতি আধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে তামা-পিতলের ঘড়া, থালা, ফুলদানি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

গোড়ামাটির কাজের ঐতিহ্য এদেশে বহু যুগের। মাটির কলস, হাঁড়ি, পাতিল, সালকি, ফুলদানি, দইয়ের ভাঁড়, রসের ঠিলা,



সন্দেশ ও পিঠার ছাঁচ, টেপা পুতুল, হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গা, সরষ্টী, লক্ষ্মী ইত্যাদির মূর্তি গড়বার কাজে বাংলাদেশের পাঞ্জাড়া ও কুমোরপাড়ার অধিবাসীরা সারা বছরই ব্যস্ত থাকে। আধুনিক বুচির ফুলদানি, ছাইদানি, চাঁপের সেট, কোটা, বাঙ্গ বা ঘর সাজাবার নানা ধরনের শৌখিন সামগ্রী সব কিছুই মাটি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। এ ছাড়া পুরাকালের মসজিদ বা মন্দিরের গায়ে মেসব নকশাদার ইট দেখা যায় তা এদেশের লোকশিল্পের এক অঙ্গনীয় নির্দর্শন।

প্রতীকর্থমী মাটির টেপা পুতুলগুলোর মধ্যে শত শত বছর পূর্বের পাল বা কুমোরদের যে কারিগরিবিদ্যা এবং শিল্পানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়, তা অভাবনীয়।

কাঠের কাজের খুব বেশি শিল্পাণু আজকাল দেখা না গেলেও অতীতের কিছু কিছু নমুনা যা দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ দেশে এক সময় গৃহনির্মাণের কাজে কারুকার্যে ভূষিত কাঠের ব্যবহার ছিল। বিশেষ করে পুরাতন খাট-পালজৰ, খুঁটি-দরজা ইত্যাদির নমুনা আজও দেখা যায়। এ ধরনের কাজকে বলা হয় হাসিয়া। বরিশালের কাঠের সৌকার কাজও বেশ নিপুণতার দাবি রাখে।

খুলনার মাদুর এবং সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত। শ্রীমকালে ব্যবহারে আরামদায়ক বলেই নয়, শীতলপাটির নকশা একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। অতীতে শীতলপাটির বহু দক্ষ কারিগর ছিল। এ শিল্পাদের দিয়ে এককালে ঢাকার নবাব পরিবার হাতির দাঁতের শীতলপাটি তৈরি করিয়েছিলেন। ঢাকার জাদুঘরে তা সংরক্ষিত আছে। এটি আমাদের লোকশিল্পের এক অঙ্গনীয় নির্দর্শন।

আমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে যে শিকা, হাতপাথা, ফুলপিঠা তৈরি করা হয়, তা মোটেই অবহেলার জিনিস নয়। এদের বিচির নকশা, রং এবং কারিগরি সৌন্দর্যের যে নির্দর্শন ঢাঁকে পড়ে তা শুধু আমাদের অতি আপন বস্তুই নয়, সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এদের স্থান বহু উচ্চে। সাধারণ সামগ্রী হলেও যাঁরা এগুলো তৈরি করেন তাঁদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রকাশ ঘটে এসব জিনিসের মধ্যে দিয়ে। শিকা গৃহস্থালির জিনিসপত্র ঝুলিয়ে রাখার

## সাহিত্য কণিকা

জন্য তৈরি, একথা সকলেই জানে। শুধু শুধু প্রয়োজন মিটলেই মন ভরে না বলে সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ নানা নকশা জুড়ে দিয়ে তাকেও একটি বিশেষ শিল্পবস্তুতে পরিণত করেছে।

আমাদের দেশে বাঁশ অপ্রতুল নয়। বাঁশের নানারকম ব্যবহার ছাড়া আমাদের চলতেই পারে না। ছোটখাটো সামান্য হাতিয়ারের সাহায্যে আমাদের কারিগররা বাঁশ দিয়ে আজকাল আধুনিক বুচির নানা ব্যবহারিক সামগ্রী তৈরি করছে যা শুধু আমাদের নিজেদের দেশেই নয়, বিদেশেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া সোলাশিল্পের উৎকৃষ্ট সূজনশীল নমুনাও দেখা যায় পুতুল, টোপর ইত্যাদির মধ্যে।

কাপড়ের পুতুল তৈরি করা আমাদের দেশের মেয়েদের একটি সহজাত শিল্পগুণ। অনেকাংশে এসব পুতুল প্রতীকধর্মী। অবশ্য আজকাল বাস্তবধর্মী কাপড়ের পুতুল তৈরিও শুরু হয়েছে। এগুলো যেমন আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি বিদেশি পয়সাও উপার্জন করে।

লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর, শহরতলি এবং গ্রামের হাজার হাজার নারী-পুরুষ আছে, যারা কাজ করতে চায় অথচ কাজের অভাবে দিন দিন দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সুরুচিপূর্ণ লোকশিল্প প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিলে তাদের সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

আমাদের সকলকেই আজ আপন পরিবেশ এবং পরিস্থিতির দিকে শুধু ঢোখ দিয়ে তাকালে হবে না, হৃদয় দিয়েও তাকাতে হবে। লোকশিল্পের ভিতর দিয়ে হৃদয়-মনের প্রকাশ হলে তা বিদেশিদের হৃদয়ে সাড়া জাগাবে। এভাবে দেশে দেশে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজেও আমাদের লোকশিল্প সাহায্য করতে পারে।

## শব্দার্থ ও টীকা

---

নিবিড়	— ঘনিষ্ঠ।
পণ্য	— বিক্রি করা যায় এমন জিনিস।
লোকশিল্প	— দেশি জিনিস দিয়ে দেশের মানুষের হাতে তৈরি শিল্পসমূহ দ্রব্য।
অমূল্য	— মূল্য দিয়ে যার বিচার করা যায় না।
অপ্রতুল	— যথেষ্ট নয়।
দক্ষতা	— নিপুণতা, কুশলতা।
লুপ্তপ্রায়	— লোপ পেতে বসেছে এমন।
রেওয়াজ	— রীতি, পদ্ধতি, ধরন।
অনুপ্রেরণা	— উদ্দীপনা, উৎসাহ।
জীবনকথা	— জীবনের কাহিনী।

- অপরিহার্য — যা এড়ানো যায় না, আবশ্যিক।
- মণিপুরি — মণিপুর-সম্পর্কিত, মণিপুরে উৎপন্ন।
- ঠিলা — মাটির কলসি, ঘট।
- প্রতীকথর্মী — নির্দর্শনজ্ঞাপন, সংকেত।
- টোপর — হিন্দু সম্প্রদায়ের বরের মাথার মুকুট।
- টেকসই — মজবুত।
- ঐতিহ্য — অতীতের গর্ব ও গৌরবের বস্তু।
- সংরক্ষণ — বিশেষভাবে রক্ষা করা।
- সম্প্রসারণ — প্রসারিত করা, বিস্তার করা।

### পাঠের উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্প ও লোক-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবে। তারা দেশের লোকশিল্প সম্পর্কে আগ্রহী ও শুন্ধ্যাশীল হবে এবং তা সংরক্ষণে তৎপর হবে।

### পাঠ-পরিচিতি

‘আমাদের লোকশিল্প’ প্রবন্ধটি ‘আমাদের লোককৃষ্ণি’ গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। লেখক এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোক-ঐতিহ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। এ বর্ণনায় লোকশিল্পের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের পরিচয় রয়েছে। আমাদের নিত্যব্যবহার্য অধিকাংশ জিনিসই এ কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। শিল্পগুণ বিচারে এ ধরনের শিল্পকে লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।

পূর্বে আমাদের দেশে যে সমস্ত লোকশিল্পের দ্রব্য তৈরি হতো তার অনেকগুলোই অভ্যন্তর উচ্চমানের ছিল। ঢাকাই মসলিন তার অন্যতম। ঢাকাই মসলিন অধুনা বিলুপ্ত হলেও ঢাকাই জামদানি শাড়ি অনেকাংশে স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে জামদানি শাড়ি দেশে-বিদেশে পরিচিত এবং আমাদের গর্বের বস্তু।

নকশি কাঁথা আমাদের একটি গ্রামীণ লোকশিল্প। এ শিল্প আজ লুণ্ঠনায় হলেও এর কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। আপনি পরিবেশ থেকেই মেয়েরা তাঁদের মনের মতো করে কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রোপণা পেতেন। কাঁথার প্রতিটি সুচের ফোঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক-একটি পরিবারের কাহিনি, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাথা। আমাদের দেশের কুমোরপাড়ার শিল্পীরা মাটি দিয়ে তৈজসপত্র ও বিভিন্ন ধরনের শৌখিন দ্রব্য তৈরি করে থাকে। নানা প্রকার পুতুল, মূর্তি ও আধুনিক রুচির ফুলদানি, ছাইদানি, চায়ের সেট ইত্যাদি তারা গড়ে থাকে। খুলনার মাদুর ও সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত।

আমাদের দেশের এই যে লোকশিল্প তা সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। লোকশিল্পের মাধ্যমে আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারি।

### লেখক-পরিচিতি

কামরূল হাসান ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। একজন খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে দেশে-বিদেশে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর আঁকা ছবিতে এদেশের লোকজ জীবনের নানা উপাদান আমাদের ঐতিহ্য-সচেতন করে। লোকশিল্প সংরক্ষণেও তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা আর্ট ইনসিটিউটে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পরে তিনি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ডিজাইন সেন্টারের প্রধান (নকশাবিদ) নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকশিল্পের নানা উপকরণ সংগ্রহ করেন। ছবি আঁকার বিচিত্র কলাকৌশল এবং লোকশিল্পের নানা দিক সম্পর্কে তাঁর লেখা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর একটি বইয়ের নাম ‘বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা’। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কামরূল হাসান ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

### কর্ম-অনুশীলন

- ক. তোমার দেখা একটি লোকশিল্পের পরিচয় তুলে ধর।
- খ. বিভিন্ন লোকশিল্পে যেসব চিহ্ন বা প্রতীক দেখতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তার একটি তালিকা তৈরি করো (দলগত কাজ)।

### নমুনা প্রশ্ন

১. কোনটি মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল ?
  - ক. নকশি কাঁথা
  - খ. ঢাকাই মসলিন
  - গ. খদ্রের কাপড়
  - ঘ. শীতলপাটি
২. মসলিনের কারিগরদের বংশধরেরা আজও কোথায় বসবাস করছে?
  - ক. কুমিল্লা
  - খ. সিলেট
  - গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম
  - ঘ. নারায়ণগঞ্জ
৩. প্রামীণ নারীদের আবেগের সাথে সর্বাধিক সম্পৃক্ত লোকশিল্পটি হচ্ছে
  - ক. নকশি কাঁথা
  - খ. শীতল পাটি
  - গ. কাপড়ের পুতুল
  - ঘ. জামদানি শাড়ি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কামাল স্থানীয় কারিগর দ্বারা একটি পিতলের কলস তৈরি করাল। বন্ধুর বিয়েতে কলসটি উপহার দিলে কেউ কেউ উপহাস করল; আবার প্রশংসাও পেল। ক্ষুলের প্রধান শিক্ষক বললেন, স্থানীয় কারিগরদের এরূপ লোকশিল্প নিয়ে আমাদের গর্ব করা উচিত।

সুজনশীল প্রশ্ন

১. দাঢ়িয়াপুর গ্রামের রহিমা দরিদ্র হলেও শিল্পী মনের অধিকারী। ছোটবেলা থেকেই সে বাঁশ ও বেত দিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস তৈরি করত। কিন্তু আচমকা একদিন তার স্বামী মারা গেলে দুই সন্তান নিয়ে সে পথে বসে। রহিমা উপায়ান্তর না দেখে অবশ্যে সুই-সুতা হাতে তুলে নেয়। সে তার সুখ-দুঃখের জীবনালেখ্য দীঘল সুতার টানে ভাষা দিতে থাকে। একদিন বেসরকারি একটি সংস্থার মাধ্যমে তার সুচিশিঙ্গগুলো বিদেশে যায় এবং মোটা অঙ্গের অর্থ প্রাণ্ডির পাশাপাশি সে প্রচুর সুনাম অর্জন করে।

ক. কোন এলাকার ‘মাদুর’ সকলের কাছে পরিচিত ?  
খ. ‘ঢাকাই মসলিনের কদর ছিল দুনিয়া জুড়ে’—বলতে কী বোঝায় ?  
গ. স্বামীর মৃত্যুর পর রহিমার কাজটি ‘আমাদের লোকশিল্প’ প্রবন্ধে কীসের প্রতিনিধিত্ব করে? বর্ণনা কর।  
ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রহিমার অবদান ‘আমাদের লোকশিল্প’ প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. সেঁজুতির স্কুলে বার্ষিক লোকশিল্প মেলা চলছিল। সে মেলায় মাটির তৈরি একাধিক পুতুল জমা দেয়। সেগুলো একটি গ্রামীণ পরিবারকে প্রতিনিধিত্ব করে। দর্শনার্থী, বিচারক এবং প্রতিযোগী সবই মুগ্ধ হয়ে দেখেন এটি। একজন মন্তব্য লেখেন, আমাদের লোকশিল্প যে সমৃদ্ধ তা বলে শেষ করার মতো নয়। কিন্তু সময় ও রুচির পরিবর্তনে তা আজ প্রায় ধ্বংসানুভূতি। আমাদের সকলের এখনই এর প্রতি নজর দেওয়া উচিত। নইলে অচিরেই এ শিল্প ধারাকে আমরা হারাব।
- ক. শিল্পগুণ বিচারে আমাদের কুটিরশিল্প কোন শিল্পের মধ্যে পড়ে?
- খ. বর্ষাকালে নকশি কাঁথা তৈরির জন্য উপযুক্ত সময় কেন?
- গ. সেঁজুতির উদ্যোগ আমাদের লোকশিল্পের কোন কারিগরের শিল্পকে প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্বীপকে লোকশিল্প বাঁচিয়ে রাখার যে তাগিদ অনুভূত হয়েছে তা ‘আমাদের লোকশিল্প’ প্রবন্ধের লেখকের বক্তব্যকে সমর্থন করে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

# সুখী মানুষ

মমতাজউদ্দীন আহমদ



## চরিত্র পরিচিতি

নাম	বয়স
মোড়ল	৫০
কবিরাজ	৬০
হাশু	৪৫
রহমত	২০
লোক	৪০

## (প্রথম দৃশ্য)

[মোড়লের অসুখ। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। কবিরাজ মোড়লের নাড়ি পরীক্ষা করছে। মোড়লের আত্মীয় হাসু মিয়া আর মোড়লের বিশ্বাসী চাকর রহমত আলী অসুখ নিয়ে কথা বলছে।]

- হাসু : রহমত, ও রহমত আলী।  
 রহমত : শুনছি।  
 হাসু : ভালো করে শোনো, এই কবিরাজ যতই নাড়ি দেখুক, তোমার মোড়লের নিষ্ঠার নাই।  
 রহমত : অমন তয় দেখাবেন না। তাহলে আমি হাউমাউ করে কাঁদতে লেগে যাব।  
 হাসু : কাঁদ, মন উজাড় করে কাঁদ। তোমার মোড়ল একটা কঠিন লোক। আমাদের সুবর্ণপুরের মানুষকে বড় জ্বালিয়েছে। এর গরু কেড়ে, তার ধান লুট করে তোমার মোড়ল আজ ধনী। মানুষের কান্না দেখলে হাসে।  
 রহমত : তাই বলে মোড়লের ব্যারাম ভালো হবে না কেন?  
 হাসু : হবেই না তো। মোড়ল যে আত্মাচারী, পাপী। মনের মধ্যে অশান্তি থাকলে ওষুধে কাজ হয় না। দেখে নিও, মোড়ল মরবে।  
 রহমত : আর আজে-বাজে কথা বলবেন না। আপনি বাড়ি যান!  
 কবিরাজ : এত কোলাহল করো না। আমি রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করছি।  
 রহমত : ও কবিরাজ, নাড়ি কী বলছে! মোড়ল বাঁচবে তো!  
 কবিরাজ : মূর্খের মতো কথা বল না। মানুষ এবং প্রাণী অমর নয়। আমি যা বলি মনোযোগ দিয়ে তাই শ্রবণ কর।  
 হাসু : আমাকে বলুন। মোড়ল আমার মামাতো ভাই।  
 রহমত : মোড়ল আমার মনিব।  
 কবিরাজ : এই নির্ণীতির মোড়লকে যদি বাঁচাতে চাও, তাহলে একটি কঠিন কর্ম করতে হবে।  
 হাসু : বাঁধের চোখ আনতে হবে?  
 কবিরাজ : আরও কঠিন কাজ।  
 রহমত : হিমালয় পাহাড় তুলে আনব?  
 কবিরাজ : পাহাড়, সমুদ্র, চন্দ, নক্ষত্র কিছুই আনতে হবে না।  
 মোড়ল : আর সহ্য করতে পারছি না। জ্বলে গেল। হাড় ভেঙে গেল। আমাকে বাঁচাও।  
 কবিরাজ : শান্ত হও। ও রহমত, মোড়লের মুখে শরবত ঢেলে দাও।

(রহমত মোড়লকে শরবত দিচ্ছে।)

- হাসু : এই মোড়ল জোর করে আমার মুরগি জবাই করে খেয়েছে। আমি আজ মুরগির দাম নিয়ে ছাড়ব।

- মোড়ল : ভাই হাসু এদিকে এস, আমি সব দিয়ে দেব। আমাকে শান্তি এনে দাও।
- কবিরাজ : মোড়ল, তুমি কি আর কোনোদিন মিথ্যা কথা বলবে?
- মোড়ল : আর বলব না। এই তোমার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনোদিন মানুষের ওপর জবরদস্তি করব না। আমাকে ভালো করে দাও।
- কবিরাজ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর কোনোদিন লোভ করবে?
- মোড়ল : না। লোভ করব না, অত্যাচার করব না। আমাকে শান্তি দাও। সুখ দাও।
- কবিরাজ : তাহলে মনের সুখে শুয়ে থাক, আমি ওষুধের কথা চিন্তা করি।
- মোড়ল : সুখ কোথায় পাব? আমাকে সুখ এনে দাও।
- হাসু : অন্যের মনে দুঃখ দিলে কোনোদিন সুখ পাবে না।
- মোড়ল : আমার কত টাকা, কত বড় বাড়ি! আমার মনে দুঃখ কেন?
- কবিরাজ : চুপ কর। যত কোলাহল করবে তত দুঃখ বাঢ়বে। হাসু এদিকে এস, আমার কথা শ্রবণ কর।  
মোড়লের ব্যামো ভালো হতে পারে, যদি...
- রহমত : যদি কী?
- কবিরাজ : যদি আজ রাত্রির মধ্যেই—
- হাসু : কী করতে হবে?
- কবিরাজ : যদি একটি ফতুয়া সংগ্রহ করতে পার।
- রহমত : ফতুয়া?
- কবিরাজ : হ্যা, জামা। এই জামা হবে একজন সুখী মানুষের। তার জামাটা মোড়লের গায়ে দিলে, তৎক্ষণাতঃ  
তার হাড় মড়মড় রোগ ভালো হবে।
- রহমত : এ তো খুব সোজা ওষুধ।
- কবিরাজ : সোজা নয়, খুব কঠিন কাজ। যাও, সুখী মানুষকে খুঁজে দেখ। সুখী মানুষের জামা না হলে অসুখী মোড়ল  
বাঁচবে না।
- মোড়ল : আমি বাঁচব। জামা এনে দাও, হাজার টাকা বখশিশ দেব।

(বিতীয় দৃশ্য)

[বনের ধারে অর্ধকার রাত। চাঁদের স্লান আলো। ছোট একটি কুঁড়েয়রের সামনে হাসু মিয়া ও রহমত গালে হাত দিয়ে  
ভাবছে।]

- রহমত : কী তাজ্জব কথা, পাঁচ গ্রামে একজনও সুখী মানুষ পেলাম না। যাকেই ধরি, সেই বলে, না ভাই, আমি  
সুখী নই।
- হাসু : আর তো সময় নই ভাই, এখন বারোটা। সুখী মানুষ নাই, সুখী মানুষের জামাও নাই। মোড়ল তো তাহলে

এবার মরবে।

- রহমত : আহা রে, আমরা এখন কী করব! কোথায় একটা মানুষ পাব, যে কিনা—
- হাসু : পাওয়া যাবে না। সুখী মানুষ পাওয়া যাবে না। সুখ বড় কঠিন জিনিস। এ দুনিয়াতে ধনী বলছে, আরও ধন দাও; ভিখারি বলছে, আরও ভিক্ষা দাও; পেটুক বলছে, আরও খাবার দাও।  
শুধু দাও আর দাও। সবাই অসুখী। কারও সুখ নেই।
- রহমত : আমরাও বলছি, মোড়লের জন্য জামা দাও, আমাদের বখশিশ দাও। আমরাও অসুখী।
- হাসু : চুপ চুপ! ঘরের মধ্যে কে যেন কথা বলছে।
- রহমত : ভূত নাকি? চলেন, পালিয়ে যাই। ধরতে পারলে মাছভাজা করে খাবে।
- হাসু : এই যে, ভাই। ঘরের মধ্যে কে কথা বলছ? বেরিয়ে এস।
- রহমত : ভূতকে ডাকবেন না।

[ঘর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলো।]

- লোক : তোমরা কে ভাই? কী চাও?
- হাসু : আমরা খুব দুঃখী মানুষ। তুমি কে?
- লোক : আমি একজন সুখী মানুষ।
- হাসু : আঁ! তোমার কোনো দুঃখ নাই?
- লোক : না। সারা দিন বনে বনে কাঠ কাটি। সেই কাঠ বাজারে বেচি। যা পাই, তাই দিয়ে চাল কিনি, ডাল কিনি। মনের সুখে খেয়ে-দেয়ে গান গাইতে-গাইতে শুয়ে পড়ি। এক ঘুমেই রাত কাবার।
- হাসু : বনের মধ্যে একলা ঘরে তোমার ভয় করে না? যদি চোর আসে?
- লোক : চোর আমার কী চুরি করবে?
- হাসু : তোমার সোনাদানা, জামাজুতা?

(লোকটি প্রাণখোলা হাসি হাসছে)

- রহমত : হা হা করে পাগলের মতো হাসছ কেন ভাই!
- লোক : তোমাদের কথা শুনে হাসছি। চোরকে তখন বলব, নিয়ে যাও, আমার যা কিছু আছে নিয়ে যাও।
- হাসু : তুমি তাহলে সত্যিই সুখী মানুষ।
- লোক : দুনিয়াতে আমার মতো সুখী কে? আমি সুখের রাজা। আমি মন্ত বড় বাদশা।
- রহমত : ও বাদশা ভাই, তোমার গায়ের জামা কোথায়? ঘরের মধ্যে রেখেছ? তোমাকে একশ টাকা দেব।  
জামাটা নিয়ে এস।
- লোক : জামা!
- রহমত : জামা মানে জামা! এই যে, আমাদের এই জামার মতো জিনিস। তোমাকে পাঁচশ টাকা দেব।  
জামাটা নিয়ে এস, মোড়লের খুব কষ্ট হচ্ছে।
- লোক : আমার তো কোনো জামা নাই ভাই!

- হাসু : মিছে কথা বল না ।  
 লোক : মিছে বলব কেন? আমার ঘরে কিছু নাই। সেই জন্যই তো আমি সুখী মানুষ ।

### শব্দার্থ ও টীকা

কবিরাজ	— বৈদ্য; আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে যিনি চিকিৎসা করেন।
নাড়ি পরীক্ষা	— কবজির ধর্মনির গতি দেখে রোগ নির্ণয়।
মূর্খ	— নির্বোধ, বোকা, অজ্ঞ।
শ্রবণ	— কানে শোনা।
জবরদস্তি	— জোরাজুরি।
ব্যামো	— অসুখ, রোগ, ব্যারাম।
তাজ্জব	— অস্তুত, বিস্ময়কর।
প্রাণখোলা	— অক্ত্রিম, উদার, খোলা মনের।

### পাঠের উদ্দেশ্য

এ নাটিকা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করবে যে, অন্যায় ও অন্তেজিকভাবে উপার্জিত অর্থ-বিভুতি মানুষের অশান্তির মূল কারণ। বরং সৎ পথে নিজ পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করলেই জীবনে শান্তি মেলে। সুতরাং নীতিহীন পথে সম্পদ উপার্জনের পথ পরিহার করাই উত্তম।

### পাঠ-পরিচিতি

‘সুখী মানুষ’ মমতাজউদ্দীন আহমদের একটি নাটিকা। এর দুটি মাত্র দৃশ্য। নাটিকাটির কাহিনিতে আছে, মানুষকে ঠকিয়ে, মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে, ধৰ্মী হওয়া এক মোড়লের জীবনে শান্তি নেই। চিকিৎসক বলেছেন, কোনো সুখী মানুষের জামা গায়ে দিলে মোড়লের অসুস্থতা কেটে যাবে। কিন্তু পাঁচ গ্রাম খুঁজেও একজন সুখী মানুষ পাওয়া গেল না।

শেষে একজনকে পাওয়া গেল, যে নিজের শ্রমে উপার্জিত আয় দিয়ে কোনোভাবে জীবিকা নির্বাহ করে সুখে দিন কাটাচ্ছে। তার কোনো সম্পদ নেই, ফলে চোরের ভয় নেই। সুতরাং শান্তিতে ঘুমোনোর ব্যাপারে তার কোনো দুশ্চিন্তাও নেই। শেষ পর্যন্ত সুখী মানুষ একজন পাওয়া গেলেও দেখা গেল তার কোনো জামা নেই। সুতরাং মোড়লের সমস্যার সমাধান হলো না। নাটকের মূল বক্তব্য – সম্পদই অশান্তির কারণ। সুখ একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। একজনের অনেক সম্পদ থেকেও সুখ নেই। আবার আরেকজনের কিছু না থাকলেও সে সুখী থাকতে পারে।

### লেখক-পরিচিতি

মমতাজউদ্দীন আহমদ পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি সরকারি কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা শেষে ১৯৯২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতা হিসেবে তিনি বাংলাদেশে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা— নাটক : ‘স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা’, ‘রাজা অনুসারের পালা’, ‘সাত ঘাটের কানাকড়ি’,

‘আমাদের শহর’, ‘হাস্য লাস্য ভাষ্য’; প্রবন্ধ-গবেষণা : ‘বাংলাদেশের নাটকের ইতিবৃত্ত’, ‘বাংলাদেশের থিয়েটারের ইতিবৃত্ত’ ইত্যাদি। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২ রাত জুন ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

### কর্ম-অনুশীলন

- ক. ‘অর্থ-ঐশ্বর্যসূখের একমাত্র নিয়ামক’—এ বিষয় অবলম্বনে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে)।
- খ. তোমার আশেপাশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামত অবলম্বনে ‘সুখ’ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর (একক কাজ)।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘সুখী মানুষ’ নাটকার দৃশ্য সংখ্যা কত ?

- |         |        |
|---------|--------|
| ক. এক   | খ. দুই |
| গ. তিনি | ঘ. চার |

২। ‘সুখী মানুষ’ নাটকার মোট চরিত্র সংখ্যা কত ?

- |         |        |
|---------|--------|
| ক. পাঁচ | খ. ছয় |
| গ. সাত  | ঘ. আট  |

৩। ‘মনের মধ্যে অশান্তি থাকলে ওষুধে কাজ হয় না’—এ কথার অর্থ কী ?

- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| ক. মনের পরিত্রাতা সুস্থিতার পূর্বশর্ত | খ. প্রকৃত সুখ মোহমুক্তির মধ্যে |
| গ. নির্লোভ হলে সুস্থ থাকা যায়        | ঘ. কৃপণতাই ধনীদের মূল অসুখ     |

৪. ‘সম্পদই অশান্তির মূল কারণ’—এ উক্তির ভাবগত সংগতি আছে কোনটির সঙ্গে ?

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| ক. অপচয় কর না, অভাবে পড় না | খ. লাভের ধন পিপড়ায় থায় |
| গ. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু     | ঘ. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট    |

### নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

একজন লোকের অনন্ত ক্ষুধা । সে যা পায় তাই খায় । রেশনের চাল, গম, রিলিফের লোটাবাটি কম্বল । খায় পাথর পর্যন্ত । বদ হজম না হয়ে যায় কোথায় ? ভারমুক্ত হবার জন্য ছটফট করছে । কিন্তু হাজার মানুষের দীর্ঘশ্বাসের বদ প্রভাব যে তার ওপর । পেট কাটা ছাড়া উপায় নেই । আঁঁতকে ওঠে লোকটি ।

৫. লোকটিকে কার সাথে তুলনা করা যায় ?

- |            |             |
|------------|-------------|
| ক. রহমানের | খ. মোড়লের  |
| গ. হাসুর   | ঘ. কবিরাজের |

৬. তুলনাটা এ কারণে যে তারা উভয়ই—

- i. পরর্থন অপহরণকারী
- ii. নেতৃত্ব আদর্শ বিবর্জিত
- iii. নির্দয় ও মানবপ্রেম শূন্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও ii      |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

#### উদ্দীপক দুটি পড়ে সংগ্রিষ্ট প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

১. জোবেদ আলী ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য । এই নিয়ে টানা পঞ্চম বারের মত তিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলেন । হবেনই বা না কেন ? এলাকার মানুষের অসুখ-বিসুখ হলে সুস্থ না হওয়া অবধি তিনি তার শয্যা ছাড়েন না । সমস্যায় পড়লে সমাধান নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার মুখে অন্ন রোচে না । সেই তার অসুখ হলে গায়ের লোক ভেঙে পড়ল । চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে প্রার্থনা করল—আল্লাহ, তুমি আমাদের জোবেদ ভাইকে সুস্থ করে দাও ।

- ক. আযুর্বেদ শাস্ত্রমতে যাঁরা চিকিৎসা করেন তাঁদের কী বলে ?
- খ. হাসু মোড়লের মৃত্যুকামনা করে কেন ?
- গ. জোবেদ আলীর সঙ্গে ‘সুখী মানুষে’র যে মিল আছে তা ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. ‘মোড়ল যদি জোবেদ আলীর মতো হতেন তাহলে তার চিকিৎসার জন্য সুখী মানুষের জামা তালাশ করতে হতো না’—বিশ্লেষণ কর ।

### সাহিত্য কণিকা

২. সেলিম সাহেব নানা উপায়ে নানা পছায় সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। নদীর পাড় ভেঙ্গে পড়ার মতো ইদানিং বিভিন্ন অজুহাতে সে পাহাড়ের বিরাট বিরাট অংশ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। রাতে দুচিন্তায় ঘুম হয় না। তার মনে হচ্ছে যাকে তিনি এক সময় সুখের উৎস ভেবে ছিলেন তাই হয়ে উঠেছে এখন অসুখের মূল কারণ। ভাঙ্গান যেভাবে লেগেছে তাতে বোৰা যাচ্ছে পাপের ধন প্রায়শিত্বেই যাবে।
- ক. নাট্যকার মমতাজউদ্দীন আহমদ-এর পেশাগত পরিচয় কী ?  
 খ. হাসু মোড়লের আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তার অকল্যাণ কামনা করে কেন ?  
 গ. মোড়ল চরিত্রের সঙ্গে সেলিম সাহেবের চরিত্রের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. ‘মোড়ল আর সেলিম সাহেবের অসুখের মূল কারণ অভিন্ন সূত্রে গাঁথা’— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## শিল্পকলার নানা দিক

মুক্তাঙ্গা মনোয়ারা



‘আনন্দ ধারা বহিছে ভূবনে’—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের এই কথাগুলিতে শিল্পকলার মূল সত্যটি প্রকাশ পেয়েছে। সব মানুষই জীবনের এই আনন্দকে পাওয়ার জন্যে কত রকম চেষ্টা করে যাচ্ছে। আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। আনন্দকে আমরা বুঝি রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ইত্যাদির সাহায্যে, ইন্দ্ৰিয়সকলের সাহায্যে। মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন সে তার মনকে প্রকাশ করতে চায়—নানা রূপে। তাই সৃষ্টি হলো চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক। পুরাকালের গুহামানুষ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ নিজের পাওয়া আনন্দকে সুন্দরকে অন্য মানুষের মধ্যে বিস্তার করতে চেয়েছে। তাই সৃষ্টি হয়েছে নানান আভিকরে শিল্পকলা। যেমন—চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্যকলা, সংগীতকলা, অভিনয়কলা, চলচ্চিত্র, ছাপত্য ইত্যাদি কলাভঙ্গি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ তার নিজ নতুন অবদান ত্রেখে চলেছে শিল্পকলার বিস্তীর্ণ অভিনে। শিল্পকলার একটি অস্পষ্ট অর্থ আমরা বুঝতে পারি কিন্তু শিল্পকলার সঠিক অর্থ কী আর শিল্পকলার গুণাগুণ কী, এই প্রশ্ন যদি কেউ করে, তাহলে উত্তর দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন গান শুনে ভালো লাগে, ছবি দেখে ভালো লাগে, কিন্তু ভালো লাগে কেন? এই প্রশ্ন নিয়ে মানুষের মন চিন্তা-ভাবনা করতে লাগল। দেখা গেল, সকল শিল্পকলায় রূপ আছে, ছন্দ আছে, সুর আছে, রং আছে, বিশেষ গড়ন আছে, সবকিছুকে সাজাবার একটি সুবিন্যস্ত নিয়ম আছে। এই নিয়মটি লুকিয়ে থাকে, নিজেকে প্রকাশ করে না, সুন্দরের মধ্যে মিলেমিশে একটা বন্ধন সৃষ্টি করে। নিয়মটি না জানলেও সুন্দরকে চেনা যায়। একটি উপমা দেয়া যাক। পৃথিবীর সব ফুলই একই নিয়ম মেনে ফুল নাম পেয়েছে। আমরা দেখে বলি সুন্দর। এর নিয়মটি হলো, একই বিন্দু থেকে সকল পাপড়ি বিন্দুর চারিদিকে ছড়িয়ে থাকবে। কিন্তু এক নিয়ম মেনেই কত রকম ফুল। নিয়ম মেনেও ফুল স্বাধীনভাবে ফুটে ওঠে। তোমাদের এখন সুন্দরের নিয়ম জানতে হবে না, সুন্দর লাগলেই সুন্দর বলবে। সুন্দর দেখতে দেখতেই একদিন সুন্দরের বিশেষ নিয়মগুলি জানতে পারবে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, সুন্দরকে জানার

## সাহিত্য কথিকা

যে জ্ঞান তার নাম ‘নন্দনতত্ত্ব’। নন্দনতত্ত্ব মানে সুন্দরকে বিশ্লেষণ করা, সুন্দরকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা। সব সুন্দরের সৃষ্টির মধ্যেই একটা রূপ আছে, তার নাম স্বাধীনতা—অপর নাম যা খুশি তাই করা। যে কাজ সকলকে আনন্দ দেয় খুশি করে, তাই সুন্দর। স্বার্থপর বা অসংগত আমি-র খুশি নয়, অনেক মনে খুশির বিষ্ণার করা আমি। অশ্঵কার ঘর আলোকিত করবার জন্যে নিয়ম মেনে প্রদীপ ঢুলাতে হয়, ঘরে অসংগত আগুন লাগিয়ে ঘর আলোকিত করা নয়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, কত রকম জিনিস প্রয়োজন হয়—ঘটি, বাটি থেকে বিছানাপত্র। শুধু প্রয়োজন মিটলেই মানুষ খুশি হয় না—মানুষের মন বলে, প্রয়োজন মিটলেই হবে না তাকে সুন্দর হতে হবে। যেমন নকশি কাঁধা, বাত্রে বিছানায় গায়ে দিয়ে শোওয়ার জন্য একটি সামগ্ৰী—সেটা তো সুন্দর-অসুন্দর হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই প্রয়োজনের জিনিসকে সুই আৱ রঙিন সুতা দিয়ে অপূর্ব নকশা কৱে সাজিয়েছে গাঁয়ের বধুৱা। নকশি কাঁধা দেখলেই

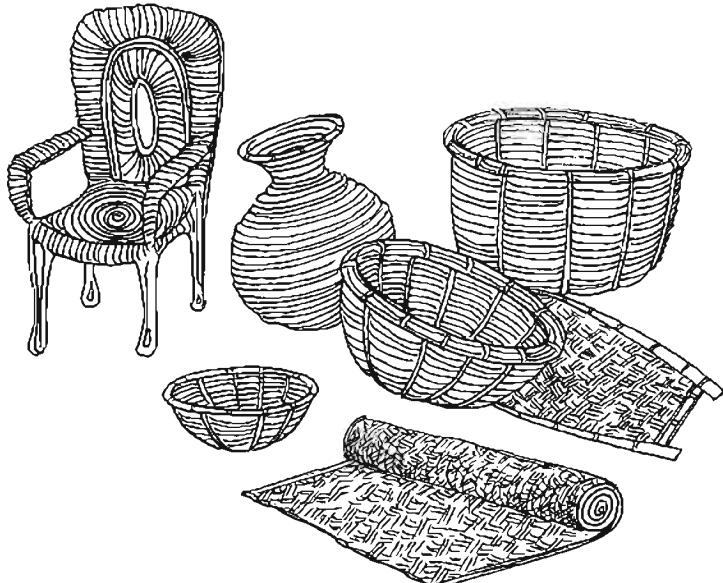
সুন্দর লাগে, জিনিসটির প্রয়োজনের  
কথা মনেই পড়ে না। এ কাৱলেই  
সকল জ্ঞানী মানুষ বলেন, সব  
সুন্দരই সৱাসি প্রয়োজনের বাইরে।  
প্রয়োজনের কাজ মিটল তো  
শৰীৱকে তৎ কৱল, আৱ  
প্রয়োজনের বাইরে যে সুন্দর তা  
মনকে তৎ কৱল। অৰ্থাৎ প্রয়োজন  
আৱ অপ্রয়োজন মিলিয়েই মানুষের  
সৌন্দৰ্যের আশা পূৰ্ণ হয়।

এবাৱ বিভিন্ন শিল্পকলা নিয়ে  
সংক্ষিপ্ত কৱে কিছু বলা যাক। ছবি  
আঁকা। বিশ্বেৰ সকল দেশেই শিশুৱা  
ছবি আঁকে। বাংলাদেশেৰ ছেটোৱা

খুব সুন্দৰ ছবি আঁকতে পাৱে। ছবি আঁকা মানে ‘দেখা শেখা’। ছেটো প্ৰকৃতিকে দেখে, মা-বাৰা, তাই-বোন  
মিলিয়ে একটা সমাজকে দেখে। প্ৰতিদিনেৰ দেখা বিষয়বস্তু, রং, গড়ন, আকৃতি শিশুমনেৰ কঢ়নার সঙ্গে  
মিলিয়ে থাক। নানা রকম গুৰু শুনে, দেশেৰ কথা শুনে, কবিতা ছড়া শুনেও শিশু মনে ছবি তৈৰি হতে থাকে।  
এ সকল দেখা-অদেখা বস্তু নিয়ে শিশুৱা ছবি আঁকে কঢ়না-বাস্তব মিলিয়ে। নিজেদেৱ মনেৰ কথা প্ৰকাশ  
কৱতে শেখে।

সকল শিল্পকলার মধ্যে কতকগুলি মূল বস্তু থাকে যেমন—বিন্দু, ৱেৰা, রং, আকাৰ, গতি বা ছন্দ, আলোচায়া  
গাঢ়-ছালকাৰ সম্পর্ক ইত্যাদি। এই সকলেৰ মিলনেই হয় ছবি বা ভাস্কৰ্য। আৱ আছে মাধ্যম, অৰ্থাৎ কোন  
মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টি হয়েছে। তিতকলার মাধ্যম হলো কালি-কলম, জল রং, প্যাস্টেল রং, তেল মিশ্ৰিত রং ইত্যাদি।  
ছেটদেৱ জন্য প্যাস্টেল ও জল রং ব্যবহাৰ কৱা সহজ হয়। বাংলাদেশে পূৰাকালে জল রং দিয়েই ছবি  
আঁকত শিল্পী। পূৱাতন পুথিতে তালপাতায় আঁকা ছবিৰ বহু নিৰ্দৰ্শন আছে। বৰ্তমানেও জল রং অত্যন্ত প্ৰিয়,  
ভবে এখন আৱ কেউ তালপাতায় আঁকে না, কাগজে আঁকে।

ভাস্কৰ্য। নৱম মাটি দিয়ে কোনো কিছুৰ রূপ দেয়া বা শক্ত পাথৰ কেটে কোনো গড়ন বানানো। বিশেষ এক



ধরনের ছাঁচ বানিয়ে গলিত মেটাল ঢেলে গড়ন বানানো, এই ধরনের কাজকে বলে ভাস্কর্য। আমাদের দেশে পোড়ামাটির ভাস্কর্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল।

আমাদের সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে উঠেছে নানান শিল্পকলার কারুকাজ দিয়ে। সকল শিল্পীর একটি দায়িত্ব আছে—দেশের ঐতিহ্যকে শুন্ধা করা। বাংলায় একটি কথা আছে—‘কালি কলম মন, লেখে তিন জন’—কালি মানে দেশের ঐতিহ্যে হাজার বছর প্রবাহিত কালি, কলম হলো শিল্পসৃষ্টির বর্তমান সরঞ্জাম, আর মন হলো বর্তমান যুগের সঙ্গে ঐতিহ্যের মিল করে নিজেকে প্রকাশ করার মন। একটি দেশকে জানা যায় দেশের মানুষকে জানা যায় তার শিল্পকলা চর্চার ধারা দেখে। শিল্পকলা চর্চা সকলের জন্য অপরিহার্য।

## শব্দার্থ ও টীকা

---

ভুবন	— পৃথিবী, জগৎ, ভূমঙ্গল।
শিল্পকলা	— চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নাচ, গান প্রভৃতি এর অনুভূতি।
রস	— সাহিত্য পাঠ করে বা ছবি দেখে মনে যে অনুভূতি জাগে।
পুরাকাল	— প্রাচীনকাল, অনেক আগেকার সময়।
গুহা-মানুষ	— প্রাচীনকালে গুহায় বসবাসকারী মানুষ।
ভাস্কর্য	— পাথর, ধাতু, কাঠ প্রভৃতি দিয়ে বানানো শিল্পকর্ম।
স্থাপত্য	— গৃহ বা ভবন নির্মাণের কাজ, নির্মাণশিল্প।
প্রাত্যহিক	— প্রতিদিনের।
নকশা কাঁথা	— সুই-সুতা দিয়ে নকশা করে বানানো কাঁথা।
গড়ন	— আকার, আকৃতি, রূপ।

## পাঠের উদ্দেশ্য

---

রচনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি হবে। চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সম্পর্কে তারা আগ্রহী হবে। তারা নতুন কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হবে।

## পাঠ-পরিচিতি

---

এই রচনাটিতে লেখক সুন্দরের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য, কবিতা সবকিছুর মধ্য দিয়েই সুন্দরকে প্রকাশ করা হয়। প্রকৃতি জগতে সুন্দরের প্রকাশ ঘটে নানাভাবে। তা দেখে

মানুষ নতুন করে সুন্দরকে সৃষ্টি করে। বিভিন্ন মাধ্যমে চলে সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া। কখনো রেখার সাহায্যে, কখনো রঙের সাহায্যে, কখনো মাটি বা পাথরের সাহায্যে সুন্দরকে সৃষ্টি করা হয়। সুন্দর বোধ মানুষের মনকে ত্রুটি করে। মানুষকে তা পরিশীলিত করে। সুন্দরের সৃষ্টিতে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

### লেখক-পরিচিতি

মুন্তাফা মনোয়ার একজন চিত্রশিল্পী। তাঁর জন্ম ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে, বিনাইদহ জেলার মনোহরপুর গ্রামে। কবি গোলাম মোন্তাফা তাঁর পিতা। তিনি কলকাতা আর্ট কলেজের কৃতী ছাত্র। ঢাকায় চারুকলা কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও শিল্পকলা একাডেমিতে মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে পাপেট থিয়েটার ও অ্যানিমেশন শিল্পকলায় আধুনিকতা প্রচলনে তিনি অগ্রদুতের ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া ‘মনের কথা’ নামে বাংলাদেশ টেলিভিশনে দীর্ঘকাল শিশুদের উপযোগী শিল্পকলাবিষয়ক একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। ১৯৭২ সাল থেকে প্রচারিত শিশু প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বহুল জনপ্রিয় ‘নতুন কুঁড়ি’ অনুষ্ঠানের বৃপ্তকার তিনি। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান প্রয়োজনায় তিনি মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশিষ্ট নৃত্য পরিকল্পনাকারী, সংগীত পরিচালক, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ সাফ গেমসের মাসকট নির্মাতা তিনি। একুশে পদকসহ বহু পদক ও পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি।

### কর্ম-অনুশীলন

- ক. সুনির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বনে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে)।
- খ. শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে স্পষ্ট ও সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মুন্তাফা মনোয়ার হলেন একজন—
 

ক. চিত্রশিল্পী	খ. ভাস্কর্যশিল্পী
গ. স্থাপত্যশিল্পী	ঘ. কারুশিল্পী
২. কোনটির মধ্য দিয়ে একটি দেশ এবং দেশের মানুষকে জানা যায় ?
 

ক. শিল্পকলাচর্চা	খ. সাহিত্যচর্চা
গ. বিজ্ঞানচর্চা	ঘ. চিত্রকলাচর্চা
- ৩। ‘সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে’ বলতে বোঝানো হয়েছে—
  - i. প্রয়োজনের মধ্যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না
  - ii. অপ্রয়োজনীয় অংশই কেবল মানব-মনকে ত্রুটি করে
  - iii. প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. iii         |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উল্লিপক্টি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তকিব হাসান কম্পিউটার সায়েসে অনাস পড়ছেন, সারাক্ষণ তার রুমের দরজা-জানালা বন্ধ করে কম্পিউটার নিয়ে তিনি বসে থাকেন। ছেট বোন মোহনা পূর্ণিমার রাতে ছাদে গিয়ে চাঁদ দেখতে বললে সে বলে—ছাদে গিয়ে চাঁদ দেখার কী আছে, জানালা দিয়েই তো চাঁদ দেখা যায়। সে সব সময় মুখটা কেমন গল্পীর করে বসে থাকে। সবার সাথে মেশেও না।

৪. শিল্পকলার বিচারে তকিব হাসানের মনে কীসের অভাব আছে ?

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ক. আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা | খ. ভাব ও অনুসন্ধিৎসা |
| গ. আনন্দ ও অনুভূতি   | ঘ. আকাঙ্ক্ষা ও আঘাত  |

৫. ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের আলোকে তকিব হাসানের উক্ত অভাববোধ থাকার কারণ—

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ক. শিল্পচর্চার অভাব   | খ. শিল্পকলার প্রতি অনাসন্তি |
| গ. সাহিত্যচর্চার অভাব | ঘ. প্রকৃতির প্রতি অনাসন্তি  |

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. মেহেরুন্নেসা এবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে নাট্যাভিনয় দেখে তিনি বান্ধবীদের সাথে ক্যাম্পাস ঘুরতে ঘুরতে এলেন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে। সেখানে দেখেন—এক হাতে বন্দুক ধরে এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকার এক ভাস্কর্য। নাম—সংশঙ্ক। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যে যুদ্ধ চালিয়ে যায় তাকেই বলে সংশঙ্ক। ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা স্মরণ করে এই ভাস্কর্যটি বানানো হয়েছে। মনটা ভরে গেল মেহেরুন্নেসার।

- |  |
|--|
| ক. মুস্তাফা মনোয়ার কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?  |
| খ. ‘প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলেই মানুষের সৌন্দর্যের আশা পূর্ণ।’—কথাটি বুঝিয়ে লেখ।    |
| গ. নবীনবরণ অনুষ্ঠানে মেহেরুন্নেসা শিল্পকলার কোন দিকটি দেখেছেন? এর বর্ণনা দাও।        |
| ঘ. ‘মেহেরুন্নেসার দেখা সংশঙ্ককই শিল্পকলার প্রধান দিক।’—মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। |

২. নদীগাল বসু তাঁর ‘শিল্পকলা’ গ্রন্থে বলেছেন—‘যে সৃষ্টির মধ্যে মানুষের প্রয়োজন সাধন অপেক্ষা অহেতুক আনন্দ বেশি, যাহাতে মানুষের জৈব অপেক্ষা আত্মিক ও মানসিক আনন্দ সৃষ্টি বেশি,

তাহাকে আমরা ললিতকলা বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারি। আবার যাহাকে আমরা ললিতকলা বলি, তাহাও আরেক দিক হইতে কারুকলা শ্রেণিভুক্ত হইতে পারে। স্থাপত্যবিদ্যাপ্রসূত সুরম্য প্রাসাদকে যখন মানুষের বসবাস উপযোগী করিয়া দেখি তখন তাহা কারুশিল্প। আবার উহাকে যখন রূপময় অসীম সৌন্দর্য সৃষ্টি হিসেবে দেখি তখন তাহা চারুকলা।'

- ক. ‘পুরাকাল’ শব্দের অর্থ কী ?
- খ. শিল্পকলাচর্চা সকলের পক্ষে অপরিহার্য কেন ?
- গ. উদ্দীপকের ললিতকলা বলতে ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের যে বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “উদ্দীপকে উদ্বিধিত চারুকলা ও কারুকলার সমন্বিত রূপই শিল্পকলা”—‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

# ମଂଡୁର ପଥେ

ବିଶ୍ୱାସ ବଜ୍ରା



ମନ୍ଦ୍ରେଯର ଆଲୋ-ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥେ, ୨୫୩ ମେ, ୨୦୦୧, ମିଯାନମାରେର (ବାର୍ମାର) ସୀମାନ୍ତ ଶହର ମଂଡୁର ପଥେ ନେମେ ଆମାର ମୁଖ, ଚୋଖ, କାନ ଓ ହୃଦୟ ଅଚେଳା ଆବେଗେ ଉପଚେ ପଡ଼ିଲ ।

ମଂଡୁ ଆମାଦେର ଟେକନାଫେର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ । ମାଧ୍ୟାମନେ ନାଫ ନଦୀ । ମଂଡୁ ବାର୍ମାର ପଞ୍ଚମ ସୀମାନ୍ତର ଶହର । ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗର ବକ୍ତୁ ଆଗେ ଥେବେ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଯୋଗାଯୋଗ । କର୍ବନ୍‌ଓ ଛିନ୍ନ, କର୍ବନ୍‌ଓ ନିରବାଛିନ୍ନ । ପାଦରି ମେଟ୍ରୋ ସେବାସ୍ଟିନ ମାନାରିକ ସଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଥେ ଏହି ପଥେ ଆସେନ । ତାରିଖ ଏକଶ ବହର ଆଗେ ପତ୍ରୁଗିଜରା ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମେ ବସତି ହ୍ରାପନ କରେ । ତାରା ନିଜେଦେର ବସତିର ଜାଗଗାକେ ବ୍ୟାଡ଼େଲ ବଲତ । ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମେ ଏଥିର ବ୍ୟାଡ଼େଲ ରୋଡ ତାଦେର ଶୃତି ବହନ କରାଇଛେ ।

ମନ୍ଦ୍ରେଯର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଘନିଯେ ଆସାର ପର ଆମରା ଅଭିଵାସନ ଓ ଶୁଣ୍ଡ ଦକ୍ଷତର ଥେକେ ଛାଡ଼ା ପେରେ ଖାଚା-ଛାଡ଼ା ପାଦିର ମତୋ ଉଡ଼ାଳ ଦିଲାମ । ଏହି ପଥେ ଆସତେ ପେରେ ଖୁଣି ହେଉଛି, ପଥେ ଆରାକାନ ପଡ଼ିବେ, ଆରାକାନ ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ୍ୟାନ୍ତିମ ମ୍ରାଟୁକ-ଡୁ ଦେଖିବେ ପାର । ଏକ ସମୟ ଆରାକାନ ବାର୍ମା ଥେକେ ଆଲାଦା ସ୍ବାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଛିଲ । ତାର ପରିଧି ଛିଲ ଉତ୍ତରେ ଫେନୀ ନଦୀ ଥେକେ ଆଲାଦାନ ସାଗରେର କାହାକାହି ପୂରୋ ବଜ୍ଜୋପସାଗର ଉପକୂଳ । ମେଖାନେ ଏସେ ପଡ଼େଛି ଏଥିନ । ଆରାକାନ ରାଜ୍ୟର ରାଜସଭାଯ ଦୌଲତ କାଜୀ, ଆଲାଓଲ ସାହିତ୍ୟଚର୍ଚ କରାଇଛନ ।

ଛେଲେବେଳୋ ଥେକେ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମେ ପାଶେ ଅପର୍ବ ମିଯାନମାରେର କଥା ଶୁଣେ ଏସେହି ବୃକ୍ଷକଥାର ଗଜେର ମତୋ, ଆଜ ତା ବାସ୍ତବେ ଭେସେ ଉଠିଲ ମନ୍ଦ୍ରେଯର ଆଲୋହାମ୍ବାୟ । ଅର୍ଥକାର ପ୍ରାୟ ଗାଢ଼ ହେଲେ ଏସେହେ । ଆକାଶେ ମେଦେ କୋଳେ ଶୁକ୍ଳଗଙ୍କେର ଚାନ୍ଦ । ଆମର ହାତେ ଓ କାଁଧେ ଝୋଲାଖୁଲି । ଶୁଣ୍ଡ ଅଫିସେର ଚୌହାଦି ପେରିଯେ ପଞ୍ଚାଶ କଦମ୍ବ ନା ଯେତେଇ ବା ଦିକେ ବଢ଼ ବଢ଼ ରେଣ୍ଡୋରୀ, ପ୍ରାୟ ଜନମାନବହୀନ । ଡାନ ଦିକେ ଯୋଡ଼ ଶୁରତେଇ ଦେଖି ଏକ ମିଯାନମାର କୁମାରୀ ପାନୀଯେର ପସରା ନିଯେ ବସେଛେ । ଏକେବାରେଇ ଝୁପାଡ଼ି ଦୋକାନ । କୁମାରୀର ଦୋକାନେର ପାଶେଇ ଆର ଏକଟି ଦେ ରକମ ଦୋକାନ । ତାରପର ନୀତି ନାହିଁ । ଆମନେଇ ଶୁଣୁ ହେବେଳେ ବାଡ଼ିଯର ଓ ଦୋକାନ । ପଥେ ନେମେ ପଡ଼େଛେ ତରୁଣ-ତରୁଣୀ, ମେଯେ-ପୁରୁଷ । ପଥେ ପଥେ ମିଯାନମାରେର

যুবতি-তরুণী। কলহাস্যে মুখর। বাড়ির সামনে, দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কেউ কেউ যুবক, যুবতি, প্রৌঢ়, বৃন্দ। মিয়ানমারের সবাই লুঙ্গি পরে। মেয়েদের পরনে লুঙ্গি ও বলমলে ব্লাউজ জাতীয় জামা বা গেঞ্জি। চুলে ফুল গোঁজা, চিরুনি ও রিবন-ফিতে।

পাশ দিয়ে একটা পাইক্যা চলে যাচ্ছে। তিন চাকার রিকশা, যেমন মোটর বাইকের পাশে আর একটা চাকা লাগিয়ে ক্যারিয়ারে বউ বাচ্চা বসতে পারে, এও প্রায় তেমনি। সারা মিয়ানমারে আমাদের রিকশার বদলে পাইক্যা। স্থানীয় মুসলমানরা এর একচেটিয়া চালক। মংডুর ব্যবসাও প্রায় ওদের দখলে, আর হিন্দুরাও আছে।

ইউনাইটেড হোটেলে পৌছলাম, কিন্তু জায়গা হলো না। আগে-ভাগে যারা গেছে তারা জায়গা দখল করে নিয়েছে। প্রায় অনাথের মতো বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে নতুন হোটেলের উদ্দেশে চললাম। আমরা খুঁজে পেতে যে হোটেল পেলাম তার অবস্থা শোচনীয় বললে কম বলা হয়। বেড়ার ঘরের দোতলার মাঝবারান্দায় বসেই টের পেলাম এটা চতুর্থ শ্রেণির হোটেল হতেও পারে। কাঠের মেঝে। কাঠের যেমন-তেমন দেয়াল। বিছানায় গিয়ে পরখ করে দেখি উঁচু-নিচু চূষা জমির মতো তোশক। মশারিতে বিচিত্র ও বিপরীতধর্মী নানা রকম উৎকৃষ্ট দুর্গম্বৰ্দ্ধ। মাথার উপরে পাখা আছে। কিন্তু রাত নয়টার পর তো বিজলি থাকবে না। তখন গ্লাভস পরে হাত ধোয়ার অবস্থা হবে। নিলাম ফ্যান ছাড়া একটি কক্ষ। পরে মনে পড়ল ফ্যান থাকলেই বা কী! আমার তো রাতে ফ্যান সহ্য হয় না। বাতিও থাকবে না রাতে।

মাঝবয়সী এক নারী আমাদের প্রায় টেনে নিয়ে গেল তার রয়েল রেস্তোরাঁয়, রাতের খাওয়ার জন্য। ইউনাইটেড হোটেলে যারা উঠেছে তারা নাকি ওদিকে এক মুসলিম রেস্তোরাঁয়, খেয়ে নিচ্ছে। রয়েল রেস্তোরাঁ, মন্দ নয়। সুন্দর ঝকঝকে টেবিল-টুল। বাসন-কোসন ভদ্র। ভাতের দোকান বলেই উঁচু টেবিল ও প্লাস্টিকের টুল। সম্ভবত চীন থেকে আমদানি ওই টুল। সাধারণ বর্মি রেস্তোরাঁয় নিচু টেবিল ও টুল থাকে।

রেস্তোরাঁর রাখাইন মালকিনের বয়স প্রথমে বুঝতে পারিনি। বলে কী! ওর বড় ছেলে কলেজে পড়ে! কঞ্চবাজার ও পটুয়াখালীতে রাখাইন আছে। এখন বুঝতে পারলাম আমার দেশের রাখাইনদের কত কম জানি। তাদের খাদ্যভ্যাস, আচার-আচরণ, ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। তাহলে কী করে দেশের সব মানুষের সঙ্গে আমার সখ্য নিবিড় হবে।

রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো একটি মেয়ে। লুঙ্গি এবং কোমর-ঢাকা ব্লাউজ পরেছে। ওর নাম ঝরনা। চেহারা ও স্বাস্থ্য গরিব ঘরের ঝোগা-পটকা নারীর মতো।

পোড়া লঙ্কা কচলে নুন-তেল দিয়ে ভর্তা করল। একটা প্লেটে তার সঙ্গে দিল কচি লেবুপাতা। বাহু। খাস চট্টগ্রামের খাবার। আসলে এদের থেকে চট্টগ্রামের বড়ুয়ারা এই খাবার নিয়েছে। চাকমা মারমারা ধানি লঙ্কা পুড়ে নুন ও পেঁয়াজ দিয়ে ভর্তা করে। পোড়া বা সেদ্ধ ধানি লঙ্কা কুইজ্যায় বা মাটির হামানদিস্তায় পিষে নেয়। একটা রাত কেটে গেল অখ্যাত বা কুশ্ণী হোটেলে।

২৫শে মে, দ্বিতীয় দিন। মহাথেরোর সঙ্গে মংডুর প্রধান সড়ক ধরে চলেছি। বাজার। দুইপাশে বাড়ি, বাড়ির নিচে দোকান। ভেতরের বাড়িগুলো সেগুন কাঠের থাম বা পাকা থামের ওপর। গত রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। ভেজা পথ। গাছপালার পাতা চকচক করছে ধাতব নতুন টাকার মতো। বৃষ্টি শিরীষ, আম, কঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া সবই আমাদের মতো। পদাউকের পাতা লকলক করছে। পদাউকের সোনারঙ ফুল ফোটার এটিই সময়।

মিয়ানমারে ওদের নাম সেন্লা। মংডুর কিছু গাছ ত্রিটিশ আমলের। ওদের বয়স শতাব্দী বা তারও বেশি। বৃক্ষটি শিরীষ, তেঁতুল এবং একটু কম বয়সী নারকেল গাছ। আছে কাঠগোলাপ ও সোনালু। নারকেল সর্বত্র। বাড়ির সামনের নারকেল গাছটির গোড়ার দিকে মাথা সমান উঁচুতে অর্কিড করেছে। তাতে রঙিন ও সাদা ফুল।

পাইক্যায় বোরকা পরা মহিলা। তার ওপর মাথায় ছাতা। ছবি তুলতে যেতেই ছাতা দিয়ে আড়াল তুলে দিল। হাঁটতে হাঁটতে শহরের পূর্ব দিকে শেউইজার সেতু পার হয়ে গেলাম। নদীর নাম সুধার ডিয়ার। এপারে মংডু, ওপারে সুধার পাড়া। মুসলিম গ্রাম।

সেতুর কাছেই পাঁচ-সাতজন মাছ নিয়ে বসেছে। তরিতরকারি নিয়ে বসেছে কয়েকজন। গ্রামের ছোট বাজার। পাঁচ-ছয়টা বেড়ার দোকান। বুড়ো আঙুলের সমান চিহ্নিতে কিলো ৪ থেকে ৫ শ চা। আমাদের তুলনায় পানির দাম। টাকার হিসাবে ৪০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে। নদীর উজান দিকে বিলে দেখা যাচ্ছে চিংড়ির ঘের। অচেল মাছ পাওয়া যায় ওখানে। চায়ের দোকান থেকে লোকজন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মংডুতে এখনো প্যান্ট দেখিনি। শুধু আমাদের পরনে প্যান্ট। মহাখেরো চীবর পরেছেন। বর্মিরা সবাই লুঙ্গি পরেছে। অফিস কাছারিতেও লুঙ্গি। গতকাল শুল্ক অফিসের দুজনের প্যান্ট দেখেছি। ওরা পুলিশ। অন্যদের লুঙ্গি। লুঙ্গি, ফুঙ্গি ও প্যাগোড়া এই তিনি নিয়ে মিয়ানমার। ফুঙ্গি হলো বৌদ্ধ ভিক্ষু। গম (ভালো), ছামান বা সাম্পান, ছা (শাবক), থামি (বর্মি রমণীদের সেলাইবিহীন লুঙ্গি) ইত্যাদি অনেক শব্দ বার্মা ও আরাকান থেকে চট্টগ্রাম হয়ে বাংলা ভাষায় ঢুকেছে।

বাসের চালে যাত্রীদের সঙ্গে ফুঙ্গি। পথে ঘাটে ফুঙ্গি। সকালে তারা খালি পায়ে ভিক্ষে করতে বের হন। ভিক্ষে ছাড়া ভিক্ষু বা ফুঙ্গিদের চলবে না। ভিক্ষাই তাদের জীবিকা। ভিক্ষুদের পরিধেয় চীবর সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো। গায়ে আলাদা অন্য এক টুকরো চীবর থাকে। হাত কাটা ও এক কাঁধ কাটা একটা গেঞ্জি থাকে, কোমরে বেল্ট জাতীয় অর্থাৎ সেলাই করা কাপড়ের কোমর বন্ধনী থাকে। এসব মিলে ত্রিচীবর। আর হাতে থাকে ছাবাইক বা ভিক্ষাপাত্র। আদিতে এটি কাঠ বা লোহার হতো। এখন লাক্ষ্মা দিয়ে তৈরি হয়। ভিক্ষুদের চীবর বিশেষ মাপে এবং অনেক জোড়া দিয়ে সেলাই করা হয়। এটি নিয়ম। সাধারণ লাল ও লালের কাছাকাছি রঙে চীবরে রঙ করা হয়। বার্মায় ফুঙ্গিদের অত্যন্ত সমানের চোখে দেখা দেখা হয়।

ছেলে-বুড়ো মুক-যুবতি সবার পরিধানে লুঙ্গি। স্কুলের পোশাকও লুঙ্গি ও জামা বা শার্ট। বর্মি মুসলিমান-হিন্দু-বড়ুয়া-খ্রিস্টান সবার লুঙ্গি। বর্মিরা শার্টটি লুঙ্গির নিচে গুঁজে দেয়। মংডুর মুসলিমরা শার্ট পরে লুঙ্গির বাইরে। বার্মা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে বাংলাদেশে লুঙ্গি প্রবেশ করে। মাত্র একশ বছরের মধ্যে সারা বাংলা হয়ে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত লুঙ্গি চলে গেছে। লুঙ্গি, শার্ট ও বর্মি কোট, মাথায় বর্মি টুপি, পায়ে দুই ফিতের মজবুত স্যাঙ্গেল বর্মিদের জাতীয় পোশাক।

লোকজন আমাদের দেখছে। আমাদের পোশাক ও চাল-চলন ওদের থেকে ভিন্ন। সব দেশের লোক বিদেশিদের চিনতে পারে। সেতু পেরিয়ে ফিরে আসছি। কিছুদুর এসে মূল রাস্তা থেকে ডান দিকে বর্মি পাড়ায় ঢুকে পড়লাম। রাস্তার মোড়ে খালি জায়গায় বড় শিরীষ গাছের নিচে মিয়ানমারের তরুণী নুডলস বিক্রি করছে। ভাসমান দোকান। সকালের টিফিন এ রকম এক দোকানে পুলকসহ খেয়েছি। নুডলস, পোড়া লঙ্কাগুড়ো, তেঁতুলের টক, কলার খোড় ইত্যাদি সবজি দিয়ে সুপ, ডিমসেন্ধ মিশিয়ে খেয়েছি। ডিমের খোসা ফেলে

কঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ক্ষিপ্ত গতিতে। আমার মোটামুটি ভালোই লেগেছে। সকালের জন্য আদর্শ খাবার বলা যায়। সঙ্গে বিনি পয়সায় দুধ চিনি ছাড়া চা দিয়েছে। দোকানি মাঝবয়সী মহিলা। ইঙ্গিতে, ইংরেজিতে কোনোমতে এক রকম করে কথা হলো। বুবাতে পারছি সারা ভ্রমণ এভাবে অপূর্ণ কথাবার্তা বলতে হবে।

দোকানটির দিকে এগিয়ে গেলাম। মাথার উপর ছত্রাকার শিরীষ গাছের নিচে পলিথিন টাঙ্গিয়ে দিয়েছে। লম্বা বেঞ্চিতে খাবারের বড় বড় ডেকচি। টুল আছে বসার। তরুণী বলল, বিকিকিনি শেষ। নুডলস আছে, কিন্তু মশলাপাতি ও তেঁতুলের ঝোল ফুরিয়ে গেছে। ওখান থেকে একটু এগিয়ে চায়ের দোকানে চুকলাম। মালকিন বসে আছে চেয়ারে। রোয়াইংগা মুসলিম বয় আছে দুজন। কিন্তু বিস্কুট বা সে রকম কোনো খাবার নেই। দুধ চিনির চা ও বিনি পয়সার চা আছে। দোকানের ভেতরে আরেক মহিলা চুরুট সিগারেট ও পান বেচতে বসেছে। অন্য মহিলারা আছে রান্নাঘরে। চা বানিয়ে দিচ্ছে। মহিলারা চিরস্বাধীন। দোকানের মালিক তারা। সবই খুব সাধারণ মানের। চা খেয়ে বেরিয়ে এলাম।

## শব্দার্থ ও টীকা

---

নিরবচ্ছিন্ন	— একটানা, অবিরাম, নিরস্তর।
পাদরি	— খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক।
অভিবাসন	— স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে বসবাস।
শুঙ্ক দফতর	— পণ্ড্রব্যের আমদানি রঞ্জনির ওপর কর ধার্য করে এমন অফিস।
দৌলত কাজী	— সতেরো শতকের কবি, আরাকান রাজসভায় সাহিত্যচর্চা করেন।
আলাওল	— সতেরো শতকের কবি, আরাকান রাজসভায় সাহিত্যচর্চা করেন। ‘পদ্মাবতী’ তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য।
শুক্রপক্ষ	— অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্রকলার বাড়ার সময়।
ক্যারিয়ার	— গাড়ির পেছনে থাকা মালপত্র বা জন পরিবহনের জায়গা।
গ্লাভস	— দন্তানা, হাতমোজা।
মালকিন	— মহিলা মালিক, মালিকের শ্রী।
হামানদিস্তা	— দ্রব্যসামগ্ৰী গুঁড়ো কৰার জন্য ব্যবহৃত পাত্র ও দড়।
মহাথেরো	— বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রধান গুরু।
চা	— মিয়ানমারের টাকা।
চীবর	— বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধেয় গৈরিক পোশাক।
ফুঙ্গি	— মায়ানমার অঞ্চলের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা পুরোহিত।

- প্যাগোড়া — বৌদ্ধমন্দির।  
লাক্ষ্মা — গালা, লাল রঙের বৃক্ষনির্যাস।

### পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা প্রতিবেশী একটি দেশের অর্থনীতি, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির রূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। ওই দেশ সম্পর্কে তাদের মনে আগ্রহ ও ভালোবাসা সঞ্চারিত হবে।

### পাঠ-পরিচিতি

আমাদের পূর্ব দিকের দেশ মিয়ানমার। সেই দেশ ভ্রমণের ফলে লেখক যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করেন তার কিছু বিবরণ এই রচনায় পরিবেশিত হয়েছে। মিয়ানমারের পশ্চিম সীমান্তের শহর মংডু দিয়ে লেখকের ওই দেশ সফর শুরু হয়েছিল। মংডুর মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে একটি ধারণা এই রচনা থেকে পাওয়া যায়। মংডুতে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের লোক সম্পর্কেও পরিচয় আছে এতে। সেখানকার মেয়েরা অনেকটা স্বাধীনভাবে ব্যাবসা-বাণিজ্য করে। মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য থাকলেও মংডুতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানের বসবাস লক্ষ করেছেন লেখক।

### লেখক-পরিচিতি

বিপ্রদাশ বড়ুয়ার জন্ম ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের ইছামতী গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি শিশু একাডেমিতে কর্মরত ছিলেন। তিনি গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন, লিখেছেন শিশুতোষ গল্প-উপন্যাস। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— ছোটগল্প: ‘যুদ্ধজয়ের গল্প’, ‘গাঙ্গচিল’; উপন্যাস: ‘মুক্তিযোদ্ধারা’; প্রবন্ধ: ‘কবিতায় বাকপ্রতিমা’; নাটক: ‘কুমড়োলতা ও পার্থি’; জীবনী: ‘বিদ্যাসাগর’(১৯৮৮), ‘পল্লীকবি জসীমউদ্দীন’; শিশুতোষ গল্প: ‘সূর্য লুঠের গান’, শিশুতোষ উপন্যাস: ‘রোবট ও ফুল ফোটানোর রহস্য’। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং দুবার অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

### কর্ম-অনুশীলন

- ক. ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণ কাহিনিটির কোন কোন বিষয় তোমাকে আনন্দ দান এবং অনুপ্রাণিত করেছে তার বিবরণ দাও।  
খ. তোমার ব্যক্তিগত ভ্রমণের বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর (একক কাজ, ছবি ভৌগোলিক চিত্র ইত্যাদি সংযোজন করা যাবে)।

### নমুনা প্রশ্ন

#### **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১. মিয়ানমারে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কী বলা হয় ?
 

ক. পুরোহিত	খ. ফুঙ্গি
গ. ব্রাহ্মণ	ঘ. মহাথেরো
২. ভিক্ষুদের পরিধেয় চীবর দেখতে কেমন ?
 

ক. কাঁধ কাটা গেঞ্জির মতো	খ. সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো
গ. সেলাই করা লুঙ্গির মতো	ঘ. কোমরের বেল্টের মতো
৩. সবদেশের লোক বিদেশিদের চিনতে পারে—
  - i. পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে
  - ii. চালচলন দেখে
  - iii. খাবার-দাবার দেখে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

#### **উদ্দিপ্তকটি পড়ে উভয় দাও :**

অনুদাশজ্ঞর রায় ফ্রাঙ্গের প্যারিস নিয়ে লেখা ‘পারী’ প্রবন্ধে বলেছেন—‘পারীর যারা আসল অধিবাসী, খুব খাটতে পারে বলে তাদের সুনাম আছে। মেয়েরা গল্প করার সময়ও জামা সেলাই করে। জামা-কাপড়ের শখটা ফরাসিদের অসম্ভব রকম বেশি, বিশেষ করে ফরাসি মেয়েদের ও শিশুদের।’

৪. উদ্দিপকে ‘মংডুর পথে’ প্রবন্ধের মিয়ানমারবাসীর সংস্কৃতির যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো—
  - i. ভোজন বিলাসিতা
  - ii. ভূষণ বিলাসিতা
  - iii. শ্রমনিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i	খ. i ও ii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

---

১. নারকেল শ্রীলংকানদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। নারকেল তেল ছাড়া তারা কোনো খাবার রান্না করে না। কারিতে নারকেল তেল ছাড়াও গুঁড়া শুটকি মাছ ব্যবহার করা হয়। এই গুঁড়া শুটকিকে তারা মসলার অংশ হিসেবে দেখে। এরা রান্নায় প্রচুর মসলা এবং লাল মরিচ ব্যবহার করে।
২. শ্রীলংকার রান্নায় যেসব তরুণী চলাচল করে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। দামি পোশাক ও সাজগোজের দিকে তাদের যথেষ্ট আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। স্পষ্টতই মনে হয়, এরা জীবন-যাপনে সহজ-সুন্দর এবং এতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।
  - ক. সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো বস্ত্রটির নাম কী ?
  - খ. ‘বাণ্ডেল রোড তাদের সূতি বহন করছে’—বলতে কী বোঝানো হয়েছে।
  - গ. উদ্দীপক-১ এ ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণ কাহিনীর যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তার বর্ণনা দাও।
  - ঘ. মিয়ানমারবাসীর জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পুরো দিকটি উদ্দীপক-২ এ প্রকাশ পেয়েছে—‘মংডুর পথে’ প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

# বাংলা নববর্ষ

শামসুজ্জামান ধান



বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ। পয়লা বৈশাখে বাঙালির নববর্ষ উৎসব। নববর্ষ সকল দেশের, সকল জাতিরই আনন্দ উৎসবের দিন! শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাসই না, সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন। আমরাও সুখ- শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়েই মহা ধূমধামের সঙ্গে আমাদের নববর্ষ উৎসব উদ্যাপন করি। একে অন্যকে বলি, শুভ নববর্ষ।

বাংলা নববর্ষ এখন আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব। প্রতি বছরই এ উৎসব বিপুল মানুষের অংশগ্রহণে বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে যে এতটা প্রাপ্তের আবেগে এবং গভীর ভালোবাসায় এ উৎসব উদ্যাপিত হয় তার কারণ পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার বাঙালিকে এ উৎসব পালন করতে দেয়া হয়নি। বলা হয়েছে, এটা পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী। সে-বক্তব্য ছিল বাঙালির সংস্কৃতির ওপর এক চরম আঘাত। বাঙালি তার সংস্কৃতির ওপর এ আঘাত সহ্য করেনি। তারা এর বিরুদ্ধে বুথে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালির এ উৎসবকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সে-দাবি অগ্রহ্য হয়েছে। ফলে পূর্ববাংলার বাঙালি ফুঁসে উঠেছে। সোচার হয়ে উঠেছে প্রতিবাদে। এভাবেই পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি জাতিসম্মত গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় বাংলা নববর্ষ এবং তার উদ্যাপনের আয়োজন।

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারকে বিপুলভাবে পরাজিত করে মুক্তফ্রেস্টের সরকার গঠিত হলে মুখ্যমন্ত্রী ও বাঙালিদের জনপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সরকার

বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করেন এবং দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেটা ছিল বাঙালির এক তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়ের দিন। কিন্তু সে-বিজয় স্থায়ী হয়নি। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে এবং সামরিক শাসন জারি করে তা সাময়িকভাবে বুঝে দিয়েছে সৈরাচারী পাকিস্তান সরকার। তবু পূর্ববাংলার বাঙালি পিছু হচ্ছেন। সরকারিভাবে আর নববর্ষ উদ্যাপিত হয়নি পাকিস্তান আমলে; কিন্তু বেসরকারিভাবে উদ্যাপিত হয়েছে প্রবল আগ্রহ ও গভীরতর উৎসাহ-উদ্দীপনায়। এর মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত এবং সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ান্ট (১৯৬১)। ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার পাকুড়মূলে ছায়ান্ট নববর্ষের যে-উৎসব শুরু করে স্থাফীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বাধাহীন পরিবেশে এখন তা জনগণের বিপুল আগ্রহ-উদ্দীপনাময় অংশগ্রহণে দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রাজধানী ঢাকার নববর্ষ উৎসবের দ্বিতীয় প্রধান আকর্ষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের বর্ণাচ্চ মঞ্জল শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রায় মুখোশ, কার্টুনসহ যে-সব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীকধর্মী চিত্র বহন করা হয় তাতে আবহমান বাঙালিতের পরিচয় এবং সমকালীন সমাজ-রাজনীতির সমালোচনাও থাকে।

এবার আমরা বাংলা সন ও নববর্ষ উদ্যাপনের কথা বলি। বাংলা সনের ইতিহাস এখনো সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পড়িতই মনে করেন মুগল সম্রাট আকবর চান্দু হিজরি সনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌর সনের সমবয় সাধন করে ১৫৫৬ সাল বা ১৯২ হিজরিতে বাংলা সন চালু করেন। আধুনিক গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন মহামতি আকবর সর্বভারতীয় যে ইলাহি সন প্রবর্তন করেছিলেন তার তিতিতেই বাংলায় আকবরের কোনো প্রতিনিধি বা মুসলমান সুলতান বা নবাব বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। সেজন্যই একে ‘সন’ বা ‘সাল’ বলে উল্লেখ করা হয়। ‘সন’ কথাটি আরবি, আর ‘সাল’ হলো ফারসি। এখনো সন বা সালই ব্যাপকভাবে চালু। তবে বজ্জান্দও বলেন কেউ কেউ।

বাংলা সন চালু হবার পর নববর্ষ উদ্যাপনে নানা অনুষ্ঠানিকতা যুক্ত হয়। নবাব এবং জমিদারেরা চালু করেন ‘পুণ্যহ’ অনুষ্ঠান। পয়লা বৈশাখে প্রজারা নবাব বা জমিদার বাড়িতে আমন্ত্রিত হচ্ছেন, তাদের মিষ্টিমুখও করানো হচ্ছে। পান-সুপারিরও আয়োজন থাকত। তবে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল খাজনা আদায়। মুর্শিদাবাদের নবাবেরা এ অনুষ্ঠান করতেন। বাংলার জমিদারেরাও করতেন এ অনুষ্ঠান। জমিদারি উঠে যাওয়ায় এ অনুষ্ঠান এখন লুপ্ত হয়েছে।

পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান ছিল ‘হালখাতা’। এ অনুষ্ঠানটি করতেন ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ ক্ষয়প্রধান। তাই ফসলের মৌসুমে ফসল বিক্রির টাকা হাতে না এলে কৃষকসহ প্রায় কেউই নগদ টাকার মুখ খুব একটা দেখতে পেত না। ফলে সারাবছর বাকিতে প্রয়োজনীয় জিনিস না কিনে তাদের উপায় ছিল না। পয়লা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে তারা দোকানিদের বাকির টাকা মিটিয়ে দিতেন। অন্তত আংশিক পরিশোধ করেও নতুন বছরের খাতা খুলতেন। হালখাতা উপলক্ষে দোকানিরা ঝালের কাটা লাল নীল সবুজ বেগুনি কাগজ দিয়ে দোকান সাজাতেন। ধূপধূনা জ্বালানো হচ্ছে। মিষ্টিমুখ করানো হচ্ছে গ্রাহক-খরিদ্দারদের। হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজবের মধ্যে বকেয়া আদায় এবং উৎসবের আনন্দ উপভোগ দুই-ই সম্মন হচ্ছে। হালখাতাও এখন আর তেমন সাড়স্বরে উদ্যাপিত হয় না। এখন মানুষের হাতে নগদ পয়সা আছে। বাকিতে বিকিকিনি এখন আর আগের মতো ব্যাপক আকারে হয় না।

বাংলা নববর্ষের আর একটি প্রধান অনুষ্ঠান হলো বৈশাখী মেলা। দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখের প্রথম দিনে বার্ষিক মেলা বসে। এইসব মেলার অনেকগুলোই বেশ পুরনো। এই মেলাগুলোর মধ্যে খুব প্রাচীন ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার নেকমরদের মেলা এবং চট্টগ্রামের মহামুনির বুদ্ধপূর্ণিমা মেলা। এক সময়ে এইসব মেলা খুব ধূমধামের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সে-মেলা এখনো বসে, তবে আগের সে জৌলুস এখন

আর নেই। আগে গ্রামবাংলার এই বার্ষিক মেলাগুলোর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কারণ তখনো সারাদেশে বিস্তৃত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল স্থবির। এখন যেমন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে এক দিনের বেশি লাগে না। আগে তা সম্ভব ছিল না। নৌকা, ঘোড়ার পাড়ি, গরুর, মোমের পাড়িতে মানুষ বা পণ্য পরিবহনে বহুসময় বা কয়েকদিন লেগে যেত। এখন নতুন নতুন পাকা রাস্তা ও দ্রুতগতির যানবাহন চালু হওয়ায় সে-সমস্যা আর নেই। আগে এইসব আঞ্চলিক মেলা থেকেই মানুষ সারা বছরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে রাখত। তাছাড়া এইসব মেলা অঞ্চলবিশেষের মানুষের মিলন মেলায়ও পরিণত হতো। নানা সংবাদ আদান-প্রদান, নানা বিষয়ে মত বিনিময়েরও আদর্শ স্থান ছিল এই সব মেলা। আবার বাংসরিক বিনোদনের জায়গাও ছিল মেলা। মেলায় থাকত কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, গম্ভীরা গান, পুতুল নাচ, নাগরদোলাসহ নানা আনন্দ-আয়োজন।

নববর্ষের ওই তিনটি প্রধান সর্বজনীন উৎসব ছাড়াও বহু আঞ্চলিক উৎসব আছে। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত বলী খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭ সাল থেকে কর্বুবাজারসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের নানাস্থানে এই খেলার প্রচলন আছে। এই বিখ্যাত কুস্তি খেলাকেই বলা হয় বলী খেলা। আবদুল জব্বার নামে এক ব্যক্তি এ খেলার প্রবর্তন করেন বলে একে ‘জব্বারের বলী খেলা’ বলা হয়।

আমানিও নববর্ষের একটি প্রাচীন আঞ্চলিক মাজালিক অনুষ্ঠান। এটি প্রধানত কৃষকের পারিবারিক অনুষ্ঠান। চৈত্র মাসের শেষদিনের সন্ধিয়ারাতে গৃহকর্ত্তা এক হাঁড়ি পানিতে স্বল্প পরিমাণ অপকৃত চাল ছেড়ে দিয়ে সারারাত ভিজতে দেন এবং তার মধ্যে একটি কচি আমের পাতাযুক্ত ডাল বিসিয়ে রাখেন। পয়লা বৈশাখের সূ�্য উঠার আগে ঘর বাড়ু দিয়ে গৃহকর্ত্তা সেই হাঁড়ির পানি সারা ঘরে ছিটিয়ে দেন। পরে সেই ভেজা চাল সকলকে থেকে দিয়ে আমের ডালের কচি পাতা হাঁড়ির পানিতে ভিজিয়ে বাড়ির সকলের গায়ে ছিটিয়ে দেন। তাদের বিশ্বাস, এতে বাড়ির সকলের কল্যাণ হবে। নতুন বছর হবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির। এ অনুষ্ঠান এখন খুব একটা দেখা যায় না।

নববর্ষের এ ধরনের আরও নানা অনুষ্ঠান আছে। তোমরা নিজ নিজ এলাকায় খোঁজ নিলে তার সন্ধান পাবে। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে নানা ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায়ও নববর্ষের উৎসব হয়। নানা আনন্দময় ঝীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়ে এরা বৈসুব, সাংগ্রাই ও বিজু তিনটিকে একত্র করে ‘বৈসাবী’ নামে উৎসব করে। গ্রাম-বাংলায় নববর্ষে নানা খেলাধুলারও আয়োজন করা হতো। মানিকগঞ্জ, মুক্তীগঞ্জে হতো গরুর দৌড়, হা-ডু-ডু খেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোরগের লড়াই, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, নড়াইলে ষাঁড়ের লড়াই প্রভৃতি।

আমাদের নববর্ষ উৎসব '৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের পর নতুন গুরুত্ব ও তাৎপর্য লাভ করে। আগে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের আয়োজনের কথা বলেছি। এছাড়া বাংলা একাডেমিতে বৈশাখী ও কারুপণ্য মেলা এবং গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ও রমনা এলাকা পয়লা বৈশাখের দিনে লক্ষ মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠে। নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ছেলেরা এবং নানা রঙের শাড়ি পরে নারীরা এই অনুষ্ঠানকে বর্ণিল করে তোলে। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলের গান, লোকসংগীত এবং বাঁশির সুরে মাতোয়ারা হয়ে উঠে সমবেত আবাল-বৃন্দ-বনিতা। আনন্দময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ এই পরিবেশ আধুনিক বাঙালি জীবনের এক গৌরবময় বিষয়।

## শব্দার্থ ও টীকা

---

- পাকিস্তান আমল — ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সময়।
- ছায়ানট — বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান।
- মজল শোভাযাত্রা — মানুষের মজলকামনা করে যে মিছিল করা হয়।
- আবহমান — যা আগে ছিল এবং এখনও আছে।
- পুণ্যাহ — প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায়ের প্রতীকী অনুষ্ঠান।
- হালখাতা — পয়লা বৈশাখে আয়োজিত অনুষ্ঠান-বিশেষ।
- কবিগান — বাংলা গানের বিশেষ ধারা। দুজন গায়ক পালা করে একে অন্যের যুক্তি খন্ডন করেন গানে গানে।
- কীর্তন — গুণ-বর্ণনা, ভক্তিমূলক গান।
- যাত্রা — প্রাচীন বাংলার দৃশ্যকাব্য, মধ্যে নাট্যাভিনয়।

## পাঠের উদ্দেশ্য

---

এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে। এছাড়া তারা পাহাড়িদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও জানবে। একটি সাংস্কৃতিক আয়োজন কীভাবে বাঙালির রাজনৈতিক ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে শিক্ষার্থীরা তাও অবগত হবে।

## পাঠ-পরিচিতি

---

বাংলা নববর্ষ বাঙালির খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। আজকের বাংলাদেশ যে দ্বাধীন হতে পেরেছে, তার পেছনে নববর্ষের প্রেরণাও সক্রিয় ছিল। কারণ পাকিস্তানিরা বাঙালির প্রাণের উৎসব নববর্ষ উদ্যাপনে বাধা দিয়েছিল এবং এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছিল বাঙালিরা। বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিশেষ করে নববর্ষ উদ্যাপনের ইতিকথা মিশে আছে। আজও নববর্ষে মজল শোভাযাত্রা বের করা হয়। নববর্ষের উৎসব বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে।

বাংলা সন কে, কবে প্রচলন করেছিলেন এ নিয়ে মতান্তর থাকলেও ধরে নেওয়া হয় সম্মাট আকবরের সময় এ সনের গণনা আরম্ভ হয়। পরে জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। নববর্ষে হালখাতা, বৈশাখী মেলা, ঘোড়দৌড়, বিভিন্ন লোকমেলার আয়োজন করে সাধারণ মানুষ এ উৎসবকে প্রাণে ধারণ করেছে। বাঙালি গৃহিণীরাও আমানিসহ নানা ব্রত-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বছরের প্রথম দিনটি উদ্যাপন করে থাকে। পাহাড়ি অবাঙালি জনগোষ্ঠীও বৈসাবি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মতো করে তারা নববর্ষ উদ্যাপন করে।

সূচনার পর থেকে এই নববর্ষ পালনে নানা মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের পর থেকে আমরাও নববর্ষ উৎসব ব্যাপকভাবে পালন আরম্ভ করি এবং এখন এই উৎসব বাঙালির জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে।

### লেখক-পরিচিতি

শামসুজ্জামান খান ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে মানিকগঞ্জ জেলার চারিগামে জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ছিলেন। শামসুজ্জামান খান লেখক, গবেষক ও ফোকলোরবিদ হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো—  
প্রবন্ধসমূহ : ‘নানা প্রসঙ্গ’, ‘গণসঙ্গীত’, ‘মাটি থেকে মহীরুহ’, ‘বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ ও প্রাসঙ্গিক কথকতা’, ‘মুক্তবুদ্ধি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমকাল’, ‘আধুনিক ফোকলোর চিন্তা’, ‘ফোকলোর চর্চ’ ইত্যাদি।  
রচনা : ‘চাকাই রঞ্জারসিকতা’, ‘গ্রাম বাংলার রঞ্জারসিকতা’ ইত্যাদি। শিশুসাহিত্য : ‘দুনিয়া মাতানো বিশ্বকাপ’, ‘লোভী ব্রাহ্মণ ও তেনালীরাম’, ‘ছোটদের অভিধান’ (যৌথ)। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদক লাভ করেন। শামসুজ্জামান খান ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ই এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

### কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার এলাকার লোকজ সংস্কৃতির পরিচয় দাও (একক কাজ)।

খ. বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে তুমি তোমার বিদ্যালয়ে কী ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করবে সে সম্পর্কে একটি রূপরেখা তৈরি কর (একক কাজ)।

ନୟନୀ ପିଲ୍

ବ୍ୟାନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନ

- |                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| ১.                | বাংলা সন চালু করা হয় কোন খ্রিস্টাব্দে?           |             |
| ক.                | ১৫৫৬  | খ. ১৫৬১     |
| গ.                | ১৯৫৪  | ঘ. ১৯৬৭     |
| ২.                | সাল কথাটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?                    |             |
| ক.                | আরবি  | খ. বাংলা    |
| গ.                | ফারসি   | ঘ. উর্দু    |
| ৩.                | বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতিসম্পদের সঙ্গে যুক্ত কারণ— |             |
| i.                | এ উৎসব আমাদের সংস্কৃতির অংশ                       |             |
| ii.               | এ সময় আমরা নতুন কাপড় পরে আনন্দ করি              |             |
| iii.              | এটি প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাধ্যমে অর্জিত            |             |
| নিচের কোনটি সঠিক? |   |             |
| ক.                | i   | খ. i ও ii   |
| গ.                | i ও iii   | ঘ. ii ও iii |

ନିଚେର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପଡ଼ୁ ଏବଂ ୪ ଓ ୫ ନଂ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ଦାଉ

টুটুল টেলিভিশনে মধ্যযুগের নববর্ষের অনুষ্ঠানের কিছু অংশ দেখছিল। সেখানে দেখা যাচ্ছে ধনী-গরিব সবাই জামা কাপড় পরে জমিদার বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাচ্ছে। সেখানে তারা খাওয়া-দাওয়া শেষে জমিদারকে খুশি মনে জমির খাজনা পরিশোধ করে ফিরে আসছে।

### সূজনশীল প্রশ্ন

সীমা ও চৈতি দুই বান্ধবী। আজ তাদের খুব আনন্দের দিন, কারণ আজ নববর্ষ। তারা দুইজনে লাল পাড় সাদা শাড়ি পড়ে চলে যায় রমনার বটমুলে। সেখানে কত মানুষের ভিড়। ছেলে, মেয়ে, শিশু, বুড়ো, সবাই সেজেছে নতুন সাজে। সেখানে সীমার খালাতো বোন তাহীর সাথে দেখা। সীমা খালা-খালু সবার খোঁজ পেল তাহীর কাছ থেকে। ছেট খালাতো বোনের জন্য কিনে দিল নানান খেলনা। নিজের বাড়ির জন্য কিনে নিল কলা, ঝুঁড়ি, হাড়ি, পাতিল ইত্যাদি। চৈতি মনের আনন্দে গেয়ে উঠল :

তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমুর্ষুরে দাও উড়ায়ে,  
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক ॥

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা  
আঁশিমানে শুচি হোক ধরা ।

- ক. ছায়ানট কত সাল থেকে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরু করে ?
- খ. হালখাতা বলতে কী বোঝায় ?
- গ. চৈতির গানে বাংলা নববর্ষের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? — ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকে ‘বাংলা নববর্ষ’ প্রবন্ধের মূল সুরটিই যেন ফুটে উঠেছে। — উক্তিটি মূল্যায়ন কর।



কোথা থেকে এসেছে আমাদের বাংলা ভাষা? ভাষা কি জন্ম নেয় মানুষের মতো? বা যেমন বীজ থেকে গাছ জন্মে তেমনভাবে জন্ম নেয় ভাষা? না, ভাষা মানুষ বা তরুণ মতো জন্ম নেয় না। বাংলা ভাষাও মানুষ বা তরুণ মতো জন্ম নেয়নি, কোনো কল্পিত শর্গ থেকেও আসেনি। এখন আমরা যে বাংলা ভাষা বলি, এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। এক হাজার বছর পরও ঠিক এমন থাকবে না। ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া। বাংলা ভাষার আগেও এদেশে ভাষা ছিল। সে ভাষায় এদেশের মানুষ কথা বলত, গান গাইত, কবিতা বানাত। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধর্ম। মুপ বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের। অনেকদিন কেটে গেলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে। আর সে ভাষার বদল ঘটেই জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার।

আজ থেকে একশ বছর আগেও কারও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে। কেউ জানত না কত বয়স এ ভাষার। সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয় বাংলা ভাষায়। এক দল লোক মনে করতেন ওই সংস্কৃত ভাষাই বাংলার জননী। বাংলা সংস্কৃতের মেয়ে। তবে দুষ্টু মেয়ে, যে মায়ের কথা মতো চলেনি। না চলে চলে অন্য রকম হয়ে গেছে। তবে উনিশ শতকেই আরেক দল লোক ছিলেন, যাঁরা মনে করতেন বাংলার সাথে সংস্কৃতের সম্পর্ক বেশ দূরের। তাঁদের মতে, বাংলা ঠিক সংস্কৃতের কল্প নয়। অর্থাৎ সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি ঘটেনি বাংলার। ঘটেছে অন্য কোনো ভাষা থেকে। সংস্কৃত ছিল সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা। তা কথ্য ছিল না। কথা বলত মানুষেরা নানা রকম 'প্রাকৃত' ভাষায়। প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সংস্কৃত

থেকে নয়, প্রাকৃত ভাষা থেকেই উন্নব ঘটেছে বাংলা ভাষার।

কিন্তু নানা রকম প্রাকৃত ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাহলে কোন প্রাকৃত থেকে উন্নব ঘটেছিল বাংলার? এ সম্পর্কে প্রথম স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। বহু প্রাকৃতের একটির নাম মাগধী প্রাকৃত। তাঁর মতে মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নেয় বাংলা ভাষা। পরে বাংলা ভাষার উন্নব ও বিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন ডষ্টের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আমাদের চোখে স্পষ্ট ধরা দেয় বাংলা ভাষার ইতিহাস। যে ইতিহাস বলার জন্য আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যেতে হবে অন্তত কয়েক হাজার বছর।

ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কিছু ভাষার ধ্বনিতে, শব্দে লক্ষ করা যায় গভীর মিল। এ ভাষাগুলো যে সব অঞ্চলে ছিল ও এখন আছে, তার সবচেয়ে পশ্চিমে ইউরোপ আর সবচেয়ে পূর্বে ভারত ও বাংলাদেশ। ভাষাতাত্ত্বিকেরা এ ভাষাগুলোকে একটি ভাষাবংশের সদস্য বলে মনে করেন। ওই ভাষাবংশটির নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ বা ভারতী-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে আছে অনেকগুলো ভাষা-শাখা, যার একটি হচ্ছে ভারতীয় আর্যভাষা। ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন ভাষাগুলোকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া যায় ঝগড়ের মন্ত্রগুলোতে। এগুলো সম্ভবত লিখিত হয়েছিল যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও এক হাজার বছর আগে, অর্থাৎ ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। বেদের শ্লোকগুলো পৰিত্র বিবেচনা করে তার অনুসারীরা সেগুলো মুখ্য করে রাখত। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যেতে থাকে। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করত বদলে যেতে থাকে সে ভাষা। এক সময় সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে বেদের ভাষা বা বৈদিক ভাষা। তখন ব্যাকরণবিদরা নানা নিয়ম বিধিবন্ধ করে একটি মানসম্পন্ন ভাষা সৃষ্টি করেন। এই ভাষার নাম ‘সংস্কৃত’, অর্থাৎ বিধিবন্ধ, পরিশীলিত, শুন্ধ ভাষা। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দের আগেই এ ভাষা বিধিবন্ধ হয়েছিল।

যিশুর জন্মের আগেই পাওয়া যায় ভারতীয় আর্য-ভাষার তিনটি স্তর। প্রথম স্তরটির নাম বৈদিক বা বৈদিক সংস্কৃত। খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দ এ ভাষার কাল। তারপর পাওয়া যায় সংস্কৃত। খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দের দিকে এটি সম্ভবত বিধিবন্ধ হতে থাকে এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে ব্যাকরণবিদ পাণিনির হাতেই এটি চূড়ান্তভাবে বিধিবন্ধ হয়। বৈদিক ও সংস্কৃতকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাকৃত ভাষাগুলোকে বলা হয় মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। মোটামুটিভাবে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ভাষাগুলো কথ্য ও লিখিত ভাষারূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত থাকে। এ প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম অপভ্রংশ অর্থাৎ যা খুব বিকৃত হয়ে গেছে। বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে নানান আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা-বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ভাষা।

ডষ্টের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, পূর্ব মাগধী অপভ্রংশ থেকে উন্নত হয়েছে বাংলা; আর আসামি ও ওড়িয়া ভাষা। তাই বাংলার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আসামি ও ওড়িয়ার। আর কয়েকটি ভাষার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা রয়েছে বাংলার সঙ্গে; কেননা সেগুলোও জন্মেছিল মাগধী অপভ্রংশের অন্য দুটি শাখা থেকে। ওই ভাষাগুলো হচ্ছে মেথিলি, মাগধি, ভোজপুরিয়া। ডষ্টের মুহূর্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে অবশ্য একটু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি একটি প্রাকৃতের নাম বলেন গৌড়ী প্রাকৃত। তিনি মনে করেন, গৌড়ী প্রাকৃতেরই পরিণত অবস্থা গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে উৎপত্তি ঘটে বাংলা ভাষার।

## শব্দার্থ ও টীকা

ভাষাতাত্ত্বিক	- ভাষাবিজ্ঞানী, ভাষা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন।
শ্লোক	- সংস্কৃত ভাষার রচিত দুই পঞ্জিকির কবিতা।
দুর্বোধ্য	- যা বোঝা কঠিন, সহজে বোঝা যায় না এমন।
বিধিবন্ধ	- নিয়ম দ্বারা শাসিত, নিয়মের অধীন।
ঘনিষ্ঠ	- নিকট, নিবিড়, খুব কাছের।
উৎসৃত	- উৎপন্ন, জাত।
উৎপত্তি	- সূচনা, শুরু, জন্ম।
উদ্ভব	সূচনা, জন্ম, অভ্যন্তর, উৎপত্তি।
মাগধী প্রাকৃত	মগধ অঞ্চলের মুখের ভাষা
গোড়ী প্রাকৃত	গোড় অঞ্চলের মুখের ভাষা
অপভ্রংশ	মুখের ভাষার বিকৃত রূপ, প্রাকৃত ভাষার শেষ স্তর।

## পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার জন্মকথা জানতে পারবে। বাংলা ভাষা যে সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তাদের মমতাবোধ জাগবে।

## পাঠ-পরিচিতি

‘বাংলা ভাষার জন্মকথা’ প্রবন্ধটি হুমায়ুন আজাদের ‘কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী’ গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ভাষার ধর্ম বদলে যাওয়া। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধর্ম। শব্দেরও বদল ঘটে এবং সে সঙ্গে শব্দের অর্থেরও। এক সময় ধারণা করা হতো বাংলা এসেছে সংস্কৃত থেকে। কিন্তু সংস্কৃত ছিল লেখার ভাষা। আর প্রাকৃত ছিল মুখের ভাষা। বিশ শতকের গোড়ার দিকে মানুষের ধারণা হয়, প্রাকৃত ভাষা থেকে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলোর জন্ম হয়েছে।

জর্জ অব্রাহাম গ্রিয়ারসন প্রথম ভারতীয় উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেন এবং দেখান যে, মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও মনে করেন মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। তবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, গোড়ী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।

## লেখক-পরিচিতি

হুমায়ুন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান মুক্ষীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার রাঢ়িখাল গ্রামে। একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে তিনি তাঁর শিক্ষাজীবন শেষ করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন গবেষক হিসেবে তিনি খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর গবেষণা গ্রন্থ হচ্ছে ‘শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা’, ‘বাক্যতত্ত্ব’ ইত্যাদি। কিশোর পাঠকদের জন্য লেখা দুটি গ্রন্থ ‘লালনীল দীপাবলি’, ‘কতো নদী সরোবর’। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ‘অলৌকিক ইস্টমার’ ও ‘জলো চিতাবাঘ’ উল্লেখযোগ্য। তিনি সাহিত্য বিশেষ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। হুমায়ুন আজাদ ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানির মিউনিখ শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

କର୍ମ-ଅନୁଶୀଳନ

- ক. বাংলা ভাষার উৎপত্তি নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর (শেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে হুমায়ুন আজাদ রচিত ‘কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী’ শীর্ষক গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারলে ভালো হয়।)

খ. তোমার এলাকার আধিকারিক শব্দের একটি তালিকা তৈরি করে শেণি শিক্ষকের নিকট জমা দাও (একক কাজ)।

ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন



নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পৃথিবীতে ২৬টি ভাষাবৎশে আছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবৎশে আবার অনেকগুলো ভাষা রয়েছে। যার একটি ইন্দো-ইরানীয় ভাষা। এই ইন্দো-ইরানীয় শ্রেণির দুইটি প্রধান ভাগ—ইরানীয় ও ভারতীয় আর্য। বাংলা ভারতীয় আর্য ভাষারই বৎশধর।

৫. উল্লিখিত বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরটির সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো—
- এটি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা
  - এই স্তরের বিবর্তিত রূপই হচ্ছে বাংলা ভাষা
  - প্রিষ্টপূর্ব ১২০০ অন্দ থেকে প্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অন্দ পর্যন্ত এ ভাষার কাল
- নিচের কোনটি সঠিক?
- |    |          |    |             |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii   | খ. | i ও iii     |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

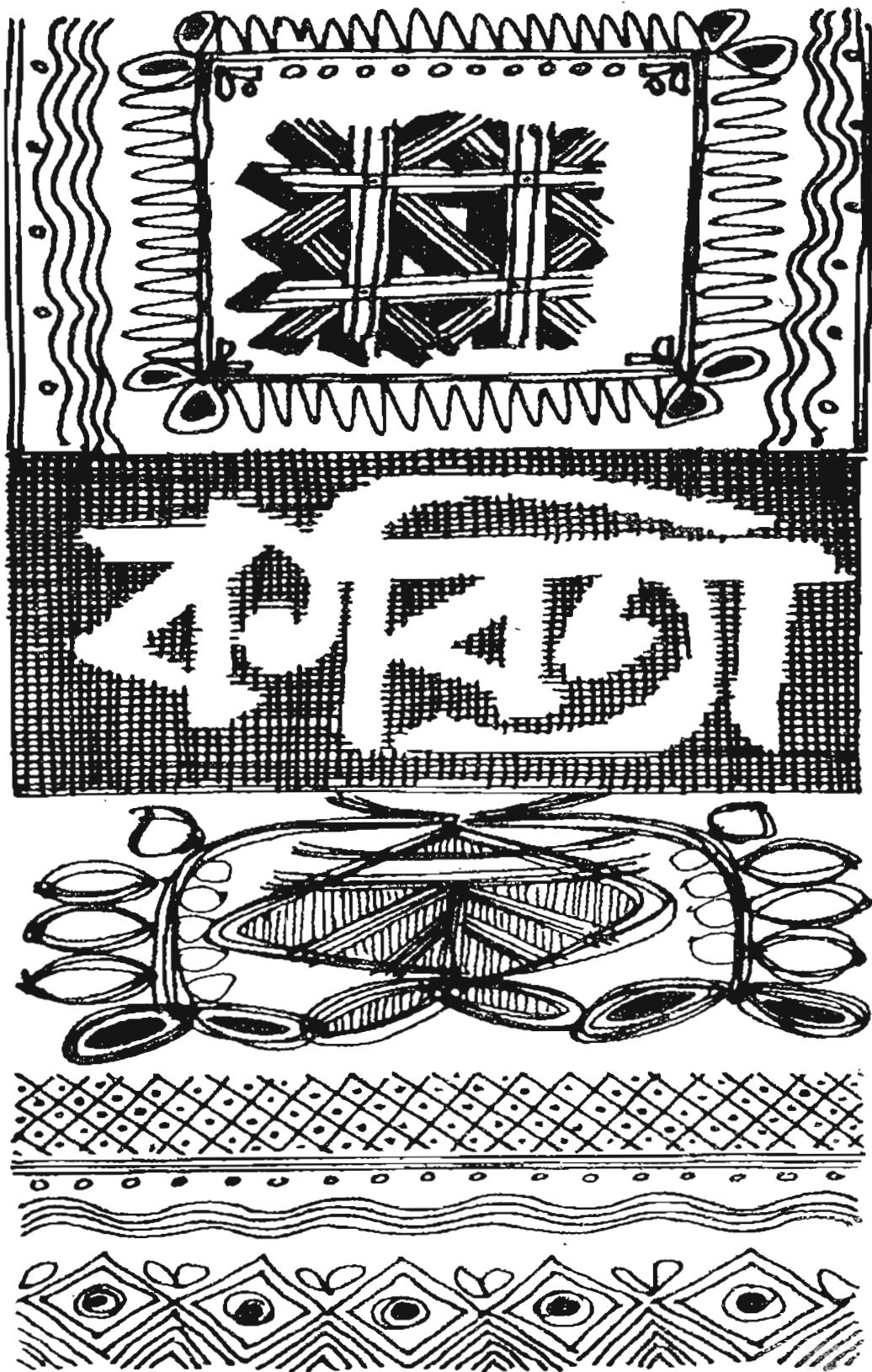
### সৃজনশীল প্রশ্ন

---

ইফতি পিয়া অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। একদিন বাংলা ব্যাকরণে ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পড়ার সময় দুটো বৈশিষ্ট্যের দিকে ওর নজর আটকে গেল। বৈশিষ্ট্য দুটি হলো—

- ভাষা যত কঠিন শব্দ দিয়েই শুনু হোক না কেন, ক্রমান্বয়ে ব্যবহারের ফলে তা সহজ ও সরল হয়ে ওঠে। যেমন-চুক > চুক > চাকা, চর্মকার > চম্পার > চামার, হস্ত > হথ > হাত ইত্যাদি। একসময় এরকম সরলীকরণ হতে হতে একটি নতুন ভাষারই উদ্ভব হয়।
- কালের পরিক্রমায় একটি ভাষা স্থানিক ও কালিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বহুবৃপ্তি হয়ে ওঠে। যেমন— ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে সারা পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিনি হাজারের মতো ভাষা ছড়িয়ে পড়েছে। ইফতি পিয়া ভাবতে থাকে।

- ক. ‘সংস্কৃত’ শব্দের অর্থ কী ?
- খ. একদল লোক বাংলাকে ‘সংস্কৃতের মেয়ে’ মনে করত কেন ?
- গ. অনুচ্ছেদের ১. নং বৈশিষ্ট্যটির মধ্য দিয়ে ‘বাংলা ভাষার জন্মকথা’ প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ইফতি পিয়া পঠিত ২. নং বৈশিষ্ট্যটি ‘বাংলা ভাষার জন্মকথা’ প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।



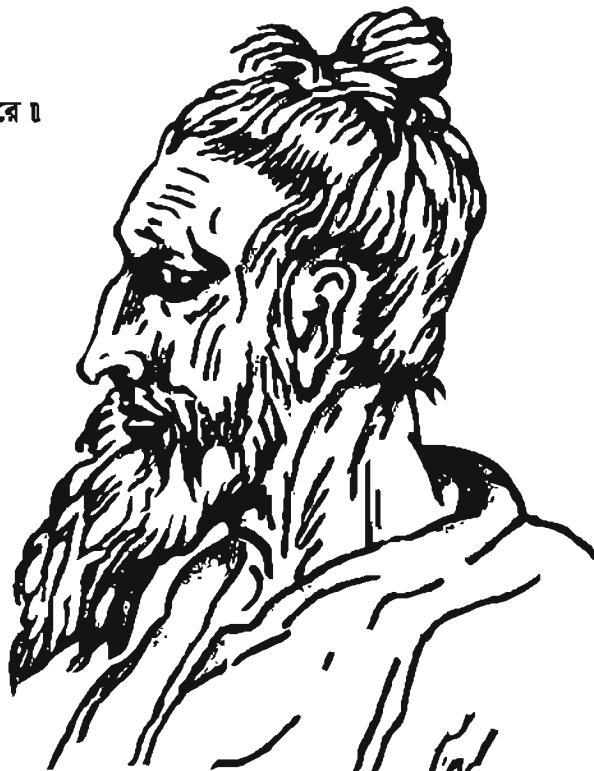
## মানবধর্ম লালন শাহ

সব লোকে কয় লালন কী জাত সৎসারে।  
লালন কয়, জেতের কী বৃপ্তি, দেখলাম না এ নজরে ॥

কেউ যালা, কেউ তসবি গলায়,  
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,  
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়  
জেতের চিহ্ন রয় কার মে ॥

গর্তে গেলে কুপজল কয়,  
গজ্জায় গেলে গজ্জাজল হয়,  
মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়,  
ভিন্ন জ্ঞানায় পাত্র-অনুসারে ॥

জগৎ বেড়ে জেতের কথা,  
লোকে গৌরব করে যথা তথা,  
লালন সে জেতের ফাতা  
বিকিয়েছে সাথ বাজারে ॥



### শব্দার্থ ও টীকা

---

কয়	— বলে।
জেতের	— জাতের। এখানে জাতি বা ধর্মকে বোঝানো হয়েছে।
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়	— জন্ম বা মৃত্যুর সময়।
কৃপজল	— কুয়োর পানি।
গঙ্গাজল	— গঙ্গা নদীর পানি। এখানে পাবিত্র অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। গঙ্গার জল হিন্দুদের কাছে পবিত্রতার প্রতীক।
জেতের ফাতা	— জাত বা ধর্মের বৈশিষ্ট্য অর্থে।

### পাঠের উদ্দেশ্য

---

এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম হবে যে, ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড়। তারা জাত-পাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা মিথ্যে গর্ব করা থেকে বিরত থাকবে।

### পাঠ-পরিচিতি

---

‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে’ গানটি ‘মানবধর্ম’ কবিতা হিসেবে এ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। এ কবিতায় লালন ফকির মানুষের জাত-পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। লালন নিজে কোন ধর্মের বা জাতের এমন প্রশ্ন আগেও ছিল, এখনো আছে। লালন বলেছেন, জাতকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। মনুষ্যধর্মই মূলকথা। কারো গলায় মালা, কারো হাতে তসবি থাকে। এগুলো ভিন্ন ভিন্ন জাতের পরিচয় বহন করে। কিন্তু জন্ম বা মৃত্যুর সময় মানুষের জাতের কোনো চিহ্ন থাকে না। মানুষ জাত ও ধর্মভেদে যে ভিন্নতার কথা বলে লালন তা বিশ্বাস করেন না।

### কবি-পরিচিতি

---

লালন শাহু মানবতাবাদী মরমি কবি। সাধক সিরাজ সাই বা সিরাজ শাহুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর তিনি লালন সাই বা লালন শাহু নামে পরিচিতি অর্জন করেন। গানে তিনি নিজেকে ফকির লালন হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভ না করলেও নিজের চিন্তা ও সাধনায় তিনি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। এই জ্ঞানের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলক্ষ্মি মিলনে তিনি নতুন এক দর্শন প্রচার করেন। গানের মধ্য দিয়ে তাঁর এই দর্শন প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাত্মাব ও মরমি রসব্যঙ্গনা তাঁর গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি সহস্রাধিক গান রচনা করেন।

লালন শাহু ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে বিনাইদহ, মতান্তরে কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়।

### কর্ম-অনুশীলন

- ক. তোমার চারদিকে নানা শ্রেণিপেশা ও ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষ রয়েছে। এদের সম্পর্কে তোমার সহপাঠীদের মনোভাব জেনে একটি গবেষণা নিবন্ধ তৈরি কর। শিক্ষকদের সহযোগিতায় প্রশ্নমালা তৈরি করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং তার আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করতে হবে। জাতি, ধর্ম, গোত্র, শ্রেণি, পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষই যে শ্রদ্ধা ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য— এই দৃষ্টিকোণ থেকে কাজটি করতে হবে।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের কোন পরিচয়টি বড় হওয়া উচিত?
 

ক. সামাজিক	খ. ধর্মীয়
গ. মানবিক	ঘ. পেশাগত
২. লালনের মতে মানুষের জন্য ক্ষতিকর—
  - i. জাতের বড়াই
  - ii. কৃপের জল
  - iii. বংশ কৌলিন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

#### উদ্দীপকটি পড়ে ঢ়ে ও ৪ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

৩. লালন শাহু রচিত গানটি ‘মানবধর্ম’ শিরোনামে গৃহীত হয়েছে। শিরোনামটির মর্মার্থ নিচের কোন পঞ্জিক্তে প্রকাশ পেয়েছে?
 

ক. এসো আজ মুঠি মুঠি মাথি সে আলো!	খ. শুন হে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।	
গ. কালো আৱ ধলো বাহিৱে কেবল	
ভিতৱে সবার সমান রাঙা।	
ঘ. পথশিশু, নরশিশু, দিদি মাৰো পড়ে	
দেঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয় ডোৱে।	

৪. উক্ত মর্মার্থে মূলত প্রকাশ পেয়েছে লালন শাহ'র—
- অধ্যাত্মভাব
  - অসাম্প্রদায়িক চেতনা
  - মানবতাবোধ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সূজনশীল প্রশ্ন

‘জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে  
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;  
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত  
একই রবি শঙ্গী মোদের সাথি।

বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ  
ভিতরের রং পলকে ফোটে  
বামুন, শুদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র  
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।’

- ‘কুপজল’ অর্থ কী?
- জাতপাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় কেন? —ব্যাখ্যা কর।
- উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় মানুষের যে মিল পাওয়া যায় তা আলোচনা কর।
- উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় যে-ধর্ম চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা মূল্যায়ন কর।



## বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ যিনতি করি পদে।  
সাধিতে মনের সাধ  
ঘটে যদি পরমাদ,  
মধুহীন করো না গো তব মনঝকোকনদে।  
প্রবাসে, দৈবের বশে,  
জীব-তারা যদি খসে  
এ দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।  
জনিলে মরিতে হবে,  
অমর কে কোথা কবে,  
চিরস্থির কবে নীর, হায় ত্রে, জীবন-নদে?  
কিন্তু যদি রাখ মনে,  
নাহি, মা, ডরি শমনে;  
মঙ্কিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হুদে।  
সেই ধন্য নরকুলে,  
লোকে যারে নাহি ভুলে,  
মনের মন্দিরে সদা দেবে সর্বজন;  
কিন্তু কোন গুণ আছে,  
যাচিব যে তব কাছে,  
হেন অমরতা আযি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে।  
তবে যদি দয়া কর,

ভুল দোষ, গুণ ধর  
 অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!  
 ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,  
 মানসে, মা, যথা ফলে  
 মধুময় তামরস কী বসন্ত, কী শরদে!

### শব্দার্থ ও টীকা

মিনতি	— বিনীত প্রার্থনা।
পরমাদ	— প্রমাদ; ভুল-ভাস্তি।
কোকনদ	— লাল পদ্ম।
নীর	— পানি; জল।
শমন	— ঘৃত্যুর দেবতা।
মক্ষিকা	— মাছি।
শ্যামা জন্মদে	— শ্যামল জন্মভূমি অর্থে।
বর	— আশীর্বাদ।
মানস	— মন।
তামরস	— পদ্ম।
শরদে	— শরৎ কাল বোঝাতে।

### পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে স্বদেশের প্রতি শিক্ষার্থীর মনে শৃঙ্খলা ও বিনয়ভাব জেগে উঠবে। বিদেশের ঐশ্বর্য ও জৌলুস সত্ত্বেও নিজ দেশের প্রতি মনের গভীরে আগ্রহবোধ সৃষ্টি হবে।

### পাঠ-পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত কয়েকটি গীতি কবিতার একটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’। এ কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দেশকে কবি মা হিসেবে কল্পনা করে নিজেকে তেবেছেন তার সন্তান। প্রবাসী মধুসূদন ভেবেছেন—মা যেমন সন্তানের কোনো দোষ মনে রাখেন না, দেশমাতৃকাও তাঁর সব দোষ ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্য তিনি বিনয়ের সঙ্গে এও বলেছেন যে, তাঁর এমন কোনো মহৎ গুণ নেই, যে-কারণে তিনি স্মরণীয় হতে পারেন। বিনয়ী কবি তাই দেশমাতৃকার কাছে এই বলে প্রণতি জানাচ্ছেন, তিনি যেন দেশমাতৃকার সৃতিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকেন।

### কবি-পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত বিরোধী লেখক। তিনি মহাকাব্য, গীতিকাব্য, সন্টো, পত্রকাব্য, নাটক, প্রহসন ইত্যাদি রচনা করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। শৈশব থেকে তাঁর মনে কবি হওয়ার তীব্র বাসনা ছিল। তিনি মনে করেছিলেন, বিলেত না গেলে কবি হওয়া যাবে না। বিলেতে গেলে সুবিধা হবে—এ আশায়

তিনি শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর নামের আগে ‘মাহিকেল’ শব্দটি যুক্ত হয়। পরে তিনি সত্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং বাংলায় সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। বাংলা, ইংরেজি ছাড়াও তিনি হিন্দি, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম মহাকাব্য ‘মেঘনাদবধু কাব্য’ রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রস্তুতি : ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’, ‘বৃড়ি সালিকের ঘাড়ে রোঁ’; নাটক : ‘শর্মিষ্ঠা’, ‘পঞ্চাবতী’, ‘কৃষ্ণকুমারী’; পত্রকাব্য : ‘বীরাজানা’ ইত্যাদি। ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ নামে একটি সনেট-সংকলনও তিনি রচনা করেন। তিনি ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

### କର୍ମ-ଅନୁଶୀଳନ

- ক. ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ শীর্ষক কবিতাটি নিয়ে আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর (প্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে। শুন্দ উচ্চারণ, উচ্চারণে স্পষ্টতা, শ্রবণযোগ্যতা, বোধগম্যতা, আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে।)

ନୟନୀ ପତ୍ର

বঙ্গনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'মঞ্চিকা'র সমার্থক শব্দ কোনটি?

  - ক. মৌমাছি
  - খ. মাছি
  - গ. বোলতা
  - ঘ. ফড়িং

২. নরকুলে ধন্য কে?

  - ক. ক্ষমতাবান ব্যক্তি
  - খ. দীর্ঘজীবী মানুষ
  - গ. যিনি কীর্তিমান
  - ঘ. মন্দিরের সেবক

নিচের কবিতাখণ্ড পড়ে ও ৩ ও ৪ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক. ওয়া তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,  
আমার এই দেশেতে জন্ম— যেন এই দেশেতে মরি ।

খ. বাংলার হাওয়া বাংলার জল  
হৃদয় আমার করে সুশীতল ।

৩. কবিতাংশে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’- কবিতার কোন চরণটির ভাব প্রকাশ পেয়েছে?

  - ক. অমর করিয়া বর, দেহ দাসে, সুবরদে !
  - খ. রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে ।
  - গ. চিরস্থির করে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?
  - ঘ. তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর

৪. ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতাটির মতো দ্বিতীয় (খ) কবিতাংশেও প্রকাশ পেয়েছে

- i. স্বদেশের প্রতি অনুরাগ
- ii. স্বদেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ
- iii. প্রশান্তি

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |           |                |
|-----------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii     |
| গ. iii    | ঘ. i, ii ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আবার আসিব ফিরে ধানসিঙ্গির তীরে— এই বাংলায়  
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;  
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে  
কুয়াশার বুকে ভোসে একদিন আসিব এ কঁঠাল-ছায়ায়;
  ২. মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,  
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।  
এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে  
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই !
- ক. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাকাব্যের নাম কী?  
 খ. কবি বর প্রার্থনা করেন কেন? ব্যাখ্যা কর।  
 গ. উদ্দীপকের প্রথম কবিতাংশের আলোকে ‘ফুটি যেন স্মৃতি-জলে’ চরণটির ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. “দ্বিতীয় কবিতাংশ ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূল সুর একই”— তুমি কি একমত?  
 যুক্তিসহ উত্তর দাও।



## ଦୂଇ ବିଷେ ଜମି

ନୀଳନାଥ ଠାକୁର

ଶୁଣୁ ବିଷେ ଦୂଇ ଛିଲ ମୋର ତୁହି, ଆର ସବହି ଗେହେ ଖପେ ।  
 ବାବୁ ବଲିଲେନ, ‘ବୁଝେଉ ଟପେନ, ଏ ଜମି ଲାଇବ କିନେ ।’  
 କହିଲାମ ଆମି, ‘ତୁମି ଭୂଷ୍ମାମୀ, ଭୂମିର ଅନ୍ତ ନାଇ ।  
 ଚେଯେ ଦେଖୋ ମୋର ଆହେ ବଡ଼ୋ-ଜୋର ଯରିବାର ଯତୋ ଠାଇ ।’  
 ଶୁଣି ରାଜା କହେ, ‘ବାପୁ, ଜାନୋ ତୋ ହେ, କରେଛି ବାଗାନଧାନା,  
 ପେଲେ ଦୂଇ ବିଷେ ପ୍ରସ୍ତେଷ ଓ ଦିଷେ ସମାନ ହଇବେ ଟାନା—  
 ଓଟା ଦିତେ ହବେ ।’ କହିଲାମ ତବେ ବକ୍ଷେ ଜୁଡ଼ିଆ ପାଣି  
 ସଜଳ ଚକ୍ଷେ, ‘କରୁନ ରଙ୍ଗେ ପରିବେର ଭିଟେଖାନି ।  
 ସଂତ ପୁରୁଷ ଯେଥାଯ ମାନୁସ ଦେ ଯାଇ ସୋନାର ବାଡ଼ା,  
 ଦୈନ୍ୟେର ଦାରେ ବେଚିବ ଦେ ଯାଇ ଏମନି ଲଞ୍ଚୀଛାଡ଼ା ।’  
 ଆଁଥି କରି ଲାଲ ରାଜା କ୍ଷପକାଳ ନାହିଁ ମୌନଭାବେ,  
 କହିଲେନ ଶେମେ କୁର ହାସି ହେସେ, ‘ଆଜ୍ଞା, ଦେ ଦେଖା ଯାବେ ।’

পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—  
 করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।  
 এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি—  
 রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।  
 মনে ভাবিলাম মোরে তগবান রাখিবে না মোহগর্তে,  
 তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।  
 সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য  
 কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য!  
 ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভূমি  
 তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।  
 হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো-মোলো—  
 একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হলো।  
 নয়োনমো নম সুন্দরী মম জননী বজ্ঞাভূমি!  
 গজার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়লে তুমি।  
 অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি  
 ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।  
 পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগোহ,  
 স্তৰ অতল দিঘি কালোজল—নিশীথশীতল স্নেহ।  
 বুকভরা মধু বজোর বধু জল লয়ে যায় ঘরে—  
 মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।  
 দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে—  
 কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে,  
 রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে  
 তৃষ্ণাতুর শেষে পঁহুচিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।  
 ধিক ধিক ওরে, শত ধিক তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি!  
 যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কী জননী তুমি!  
 সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্রমাতা  
 আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফল ফুল শাক পাতা।  
 আজ কোন রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাসবেশ—  
 পাঁচরঙ্গ পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ!  
 আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগি গৃহহারা সুখহীন—

তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী, হাসিয়া কাটাস দিন!  
 ধনীর আদরে গরব না ধরে! এতই হয়েছ ভিন্ন  
 কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সেদিনের কোনো চিহ্ন!  
 কল্যাণময়ী ছিলে তুমি আয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি!  
 যত হাসো আজ যত করো সাজ ছিলে দেবী, হলে দাসী।

বিদীপ্তিহিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি—  
 প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আমগাছ, এ কি!  
 বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,  
 একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা।  
 সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের বাড়ে রাত্রে নাহিকো ঘূম,  
 অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধূম।  
 সেই সুমধুর স্তন্ধু দুপুর, পাঠশালা পলায়ন—  
 ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!  
 সহসা বাতাস ফেলি গেল শূস শাখা দুলাইয়া গাছে,  
 দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।  
 ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা,  
 স্নেহের সে দানে বহু সমানে বারেক ঠেকানু মাথা।

হেনকালে হায় যমদুত প্রায় কোথা হতে এল মালি,  
 ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।  
 কহিলাম তবে, ‘আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব—  
 দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব!’  
 চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ  
 বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।  
 শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, ‘মারিয়া করিব খুন।’  
 বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।  
 আমি কহিলাম, ‘শুধু দুটি আম ভিথ মাগি মহাশয়।’  
 বাবু কহে হেসে ‘বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।’  
 আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে—  
 তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

### শব্দার্থ ও টীকা

---

বিঘে	— বিঘা শব্দের চলিত রূপ। জমির পরিমাপ বিশেষ। কুড়ি কাঠা বা ১৪৪০০ বর্গফুট বা ১৩৩৪ বর্গমিটার পরিমাণ জমি।
তৃষ্ণামী	— অনেক জমির মালিক, জমিদার।
দিঘে	— দৈর্ঘ্যে, লম্বা দিকের মাপে।
পাণি	— হাত।
বক্ষে জুড়িয়া পাণি	— বুকে জোড় হাত রেখে অনুনয় করে।
সঙ্গ পুরুষ	— পূর্ববর্তী সাত বৎসর বা প্রজন্ম।
লক্ষ্মীছাড়া	— লক্ষ্মী ছেড়েছে এমন, দুর্ভাগা, ভাগ্যহীন।
কুর	— নিষ্ঠুর, নির্দয়।
ডিক্রি	— আদালতের হুকুম বা নির্দেশনামা।
খত	— খণ্পত্র, খণের দলিল।
ভূরি ভূরি	— প্রচুর।
কাঙাল	— নিঃস্ব, দরিদ্র।
মোহগর্ত	— মোহের ক্ষুদ্র গহৰ।
বিশুনিখিল	— গোটা দুনিয়া, সমগ্র পৃথিবী।
হেরিলাম	— দেখলাম।
ধাম	— তীর্থস্থান।
ভূধর	— পর্বত, পাহাড়।
নমো নমো নম	— নমস্কার, বন্দনাজ্ঞাপক অভিব্যক্তি বিশেষ।
সমীর	— বাতাস, বায়ু।
ললাট	— কপাল।
খেলাগেহ	— খেলাঘর।
নিশীথ	— গভীর রাত।
নিশীথ শীতল স্নেহ	— হৃদয়জুড়ানো গভীর মমতা।
প্রহর	— তিন ঘণ্টা কাল, দিনরাত্রির আট ভাগের এক ভাগ।
গোলা	— শস্য রাখার মরাই বা আড়ত।
ত্বাতুর	— পিপাসা বা ত্বক্ষায় কাতর।
পঁয়চিনু	— পৌছে গেলাম।
লভিল	— লাভ করল, পেল।

- |        |  |
|--------|--|
| উড়ে   | — ভারতের উড়িষ্যা বা ওড়িয়া প্রদেশের লোক। |
| কলরব   | — কোলাহল, হটগোল, হৈচে।                     |
| পারিষদ | — মোসাহেব, পার্শ্চর।                       |
| ঘটে    | — মাথার মগজে, এখানে ভাগ্যে অর্থে ব্যবহৃত।  |

### পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা শোষক শ্রেণির নিষ্ঠুর শোষণ ও গরিবদের দুর্দশা সম্পর্কে জানতে পারবে। গরিবদের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল হবে।

### পাঠ-পরিচিতি

‘দুই বিঘা জমি’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চিত্রা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। দরিদ্র কৃষক উপেন অভাব-অন্টনে বন্ধক দিয়ে তাঁর প্রায় সব জমি হারিয়েছে। বাকি ছিল মাত্র দুই বিঘা জমি। কিন্তু জমিদার তাঁর বাগান বাড়ানোর জন্য সে জমি কিনে নিতে চায়। কিন্তু সাত পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত সে জমি উপেন বিক্রি করতে না চাইলে জমিদারের ক্রোধের শিকার হয় সে। মিথ্যে মামলা দিয়ে জমিদার সে জমি দখল করে নেয়। ভিটেছাড়া হয়ে উপেন বাধ্য হয় পথে বেরুতে। সাধু হয়ে সে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘোরে। কিন্তু পৈতৃক ভিটের স্মৃতি সে ভুলতে পারে না।

একদিন চির-পরিচিত গ্রামে সে ফিরে আসে। গ্রামের অন্য সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও তার ভিটে আজ নিশ্চিহ্ন। কিন্তু হঠাৎ সে লক্ষ করে তার ছোট বেলার স্মৃতি-বিজড়িত সেই আম গাছটি এখনও আছে। সেই আম গাছের ছায়াতলে বসে ঝাঙ্গ-শ্বাঙ্গ উপেন পরম শান্তি অনুভব করে। তার মনে পড়ে, ঝড়ের দিনে কত না আম সে কুড়িয়েছে এখানে। হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায় দুটি পাকা আম পড়ে তার কোলের কাছে। আম দুটিকে সে জননীর স্নেহের দান মনে করে গ্রহণ করে। কিন্তু তখনই ছুটে আসে মালি। উপেনকে সে আম-চোর বলে গালাগালি করতে থাকে। উপেনকে জমিদারের নিকট হাজির করা হয়। উপেন জমিদারের কাছে আমাটি ভিক্ষা হিসেবে চাইলে জমিদার তাকে সাধুবেশী চোর বলে মিথ্যা অপবাদ দেয়।

এই কবিতার মাধ্যমে কবি দেখাতে চেয়েছেন, সমাজে এক শ্রেণির লুটেরা বিস্তৰান প্রবল প্রতাপ নিয়ে বাস করে। তারা সাধারণ মানুষের সম্পদ লুট করে সম্পদশালী হয়। তারা অর্থ, শক্তি ও দাপটের জোরে অন্যায়কে ন্যায়, ন্যায়কে অন্যায় বলে প্রতিষ্ঠা করে। ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতাটিতে কবি এদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

### কবি-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি, বিশ্বনন্দিত কবি। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ। ছেলেবেলায় বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পড়াশোনায় তাঁর মন বসেনি। পড়াশোনার জন্য তাঁকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গাল একাডেমি—এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠ শেষ করার আগেই তিনি সেসব ছেড়ে দেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কবি-প্রতিভার উন্মোচন ঘটে। সাহিত্যের সকল শাখায় অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। কবিতা, সংগীত, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ইত্যাদি সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর পদচারণা ছিল স্বচ্ছ, উজ্জ্বল। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, গীতিকার, সুরকার, শিক্ষাবিদ, চিত্রশিল্পী, নাট্য-প্রযোজক ও অভিনেতা। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজিতে অনুদিত ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের জন্য তিনি

এশীয়দের মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আমাদের জাতীয় সংগীত ‘আমার সোনার বাংলা’ তাঁরই লেখা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

### কর্ম-অনুশীলন

- ক. কবিতাটি তোমার নিজস্ব ভাষায় গল্পে, নাটকায় বা বর্ণনাধর্মী গদ্যে বৃপ্তায়িত কর।
- খ. তোমার জোনা কোনো কৃষকের অত্যাচারিত জীবনের একটি কাহিনী লিপিবর্ণ কর (একক কাজ)।
- গ. কবিতাটির নাট্যরূপ দাও এবং শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘দুই বিঘা জমি’ কোন ধরনের কবিতা ?
 

ক. কাহিনী-কবিতা	খ. গীতিকবিতা
গ. চতুর্দশপদী কবিতা	ঘ. স্বদেশপ্রেমের কবিতা
২. ‘সেই মনে পড়ে জ্যেষ্ঠের বাড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম’—পঞ্জিকিটিতে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—
  - i. স্মৃতিকাতরতা
  - ii. স্পর্শকাতরতা
  - iii. অনুদারতা
 নিচের কোনটি সঠিক ?
 

ক. i	খ. i ও ii
গ. i ও iii	ঘ. ii ও iii
৩. বাবু সাহেবের সম্পত্তি-আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে যে চরণে, তা হচ্ছে—
  - i. বাবু কহিলেন, বুবেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে
  - ii. পেলে দুই বিঘে, প্রশ্নে ও দিঘে সমান হইবে টানা
  - iii. এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি
 নিচের কোনটি সঠিক ?
 

ক. i ও ii	খ. ii ও iii
গ. i ও iii	ঘ. ii ও iii

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

ରାଜିବ ସାହେବ ଏକ ଯୁଗ ଆଗେ ଆମେରିକାଯ ଗିଯେ ପ୍ରଚୁର ବିତ୍ତ-ବୈଭବେର ମାଲିକ ହେଁଛେ । କିନ୍ତୁ ତାରପରାଗ ତାର ମନେ ସୁଖ ନେଇ । ସେଖାନକାର ପରିବେଶ, ପ୍ରକୃତି, ମାନୁଷଜନ କୋନୋ କିଛୁଇ ତାକେ ଆକୃଷିତ କରେ ନା । ସାରାକ୍ଷଣ ମନ୍ଟା ପଡ଼େ ଥାକେ ଆଁକା-ଆଁକା ମେଠୋ ପଥେର ଧାରେର କୁଣ୍ଡେଘରେ, ଯେଥାମେ କେଟେହେ ତାର ଶୈଶବ, କୈଶୋରର ସୋନାଲି ସମୟ ।



সুজনশীল প্রশ্ন

গাজীপুর চৌরাস্তার কাছে মতিন মিয়ার ছোট এক চায়ের দোকান। আর দোকানের পাশেই ক'হাউজিং সোসাইটির বিশালাকার অ্যাপার্টমেন্ট গড়ে উঠেছে। একদিন সকালে মতিন দেখে, তার দোকান অ্যাপার্টমেন্টের সীমানা প্রাচীরের মধ্যে আটকে গেছে। সে বুরো গেল আর কিছুই করার নেই। উপযাস্তর না দেখে সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ফ্লাঙ্কে করে চা বিক্রি করে সংসার চালায় আর উদাস দৃষ্টিতে গগনচূম্বি অট্টালিকাগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

- ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিষ্টান্দে নোবেল পুরস্কার পান?

খ. ‘রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি’—বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. ‘ক’ হাউজিং সোসাইটির কার্যক্রমে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার বাবু সাহেব চরিত্রের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্দীপকের মতিন ‘দুই বিঘা জমির’ শোষিত উপনের সার্থক প্রতিনিধি কি না— এ বিষয়ে তোমার মতামত যুক্তি সহকারে উপস্থাপন কর।

## পাছে লোকে কিছু বলে

কাহিনী রাম

করিতে পারি না কাজ,  
সদা ভয়, সদা শাঙ্কা,  
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,  
পাছে লোকে কিছু বলে।

আড়ালে আড়ালে ধাকি,  
নীরবে আপনা ঢাকি,  
সমুখে চরণ নাহি চলে,  
পাছে লোকে কিছু বলে।

হৃদয়ে বুদ্বুদ মতো  
উঠে শুক্র চিঞ্চা কত,  
মিশে যায় হৃদয়ের তলে  
পাছে লোকে কিছু বলে।

কাঁদে প্রাণ যবে, আঁধি  
সবতনে শুক রাখি  
নির্মল নয়নের জলে,  
পাছে লোকে কিছু বলে।

একটি স্নেহের কথা  
প্রশংসিতে পারে ব্যথা  
চলে যাই উপেক্ষার ছলে  
পাছে লোকে কিছু বলে।

মহৎ উদ্দেশ্যে যবে  
এক সাথে মিলে সবে,  
পারি না মিলিতে সেই দশে,  
পাছে লোকে কিছু বলে।



বিধাতা দিছেন প্রাণ  
থাকি সদা ম্রিয়মাণ;  
শক্তি মরে ভীতির কবলে,  
পাছে লোকে কিছু বলে।

## শব্দার্থ ও টীকা

---

সদা	— সবসময়।
সংশয়	— সন্দেহ, দ্বিধা।
সংকল্প	— মনের দৃঢ় ইচ্ছা।
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে	— মনের দৃঢ় ইচ্ছা পূরণ করায় বাধা তৈরি হয়।
শুভ্র	— সাদা, এখানে পরিষ্কার বা অমলিন অর্থে ব্যবহৃত।
যবে	— যখন।
প্রশংসিতে	— উপশম ঘটাতে, নিবারণ করতে।
প্রশংসিতে পারে ব্যথা	— যত্নগার উপশম ঘটাতে পারে।
উপেক্ষা	— গ্রাহ্য না করা, অবহেলা করা, গুরুত্ব না দেয়া।
ছল	— ছুতা, ওজর।
ম্রিয়মাণ	— কাতর, বিষাদগ্রস্ত।

## পাঠের উদ্দেশ্য

---

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নিঃসংকোচ চিত্তে জীবনপথে পরিচালিত হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। কে কী বলল তা ভেবে নিজেকে গুটিয়ে রাখার প্রবণতা থেকে তারা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে।

## পাঠ-পরিচিতি

---

কবিতাটি ‘আলো ও ছায়া’ কাব্যগ্রন্থ নেওয়া হয়েছে। কোনো কাজ করতে গেলে কেউ কেউ অনেক সময় দিধাগ্রস্ত হয়। কে কী মনে করবে, কে কী সমালোচনা করবে এই ভেবে তারা বসে থাকে। এর ফলে কাজ এগোয় না। যারা সমাজে অবদান রাখতে চান তাদের দ্বিধা করলে চলবে না। দৃঢ় মনোবল নিয়ে লোকলজ্জা ও সমালোচনাকে উপেক্ষা করতে হবে। মানুষের কল্যাণে মহৎ কাজ করতে হলে ভয়-ভীতি সংকোচ উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে।

କବି-ପରିଚିତ

কামিনী রায় বরিশালের বাসভূ গ্রামে ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৮৮৬ সালে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ.পাস করে তিনি ওই কলেজেই অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। আনন্দ ও বেদনার সহজ-সরল প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। মানবতাবোধ ও নৈতিকতাকেও তিনি তাঁর কবিতার বিষয় করেছেন। তাঁর লেখা ছোটদের কবিতা সংগ্রহের নাম ‘গুঞ্জন’। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ – ‘আলো ও ছায়া’, ‘মাল্য ও নির্মাল্য’, ‘দীপ ও ধূপ’। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগন্নারিণী স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ১৯৩৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

କର୍ମ-ଅନୁଶୀଳନ

- ক. ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ শীর্ষক কবিতার বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে তোমার কিংবা তোমার পরিচিত লোকজনের সমস্যা নিয়ে গল্প, নাটিকা বা প্রবন্ধ রচনা কর (একক কাজ)।

খ. তোমার ভিতরকার তিনটি সমস্যা খুঁজে বের করো এবং এই সমস্যাগুলো থেকে বের হয়ে আসার উপায় লেখ (একক কাজ)।

ନମନୀ ପତ୍ର

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মহৎ কাজ সম্পাদনে কোনটিকে উপেক্ষা করা অনুচিত ?  
ক. সংকোচ খ. সংশয়  
গ. সংকল্প ঘ. বাধা

২. আর্তের পাশে দাঁড়াতে গিয়েও কেউ কেউ কেন উপেক্ষা করে চলে যান ?  
ক. রোগক্রান্ত হওয়ার ভয়ে খ. সমালোচনার ভয়ে  
গ. সহযোগিতার ভয়ে ঘ. ছোট হওয়ার ভয়ে

৩. ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতাটি পাঠকের মধ্যে কোন ধরনের অনুস্মেরণ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ?  
ক. ভয়হীনতা খ. পরোপকারিতা  
গ. সাহসিকতা ঘ. সংকোচহীনতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মাসুদ গ্রামের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। সে ভাবে এক সময় প্রচুর আয় হবে, বেকাররা স্বনির্ভর হবে। কিন্তু যদি সে এ কাজে সফল হতে না পারে, তাহলে তার সমালোচনা করবে। তাই সে তার পরিকল্পনা বাদ দেয়।

৪. উদ্দীপকের মাসুদের মাঝে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কোন বিশেষ দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. ভীরুতা | খ. সংশয়    |
| গ. হতাশা  | ঘ. দুর্বলতা |
৫. কামিনী রায়ের দৃষ্টিতেই মাসুদের এ উদ্যোগ সফল করা যেতে পারে—
- দৃঢ় সংকল্পবন্ধ হলে
  - সকল সংশয় দ্রু করলে
  - সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে
- নিচের কোনটি সঠিক ?
- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. ‘আপনারে লয়ে বিত্রত রহিতে  
 আসে নাই কেহ অবনি পরে,  
 সকলের তরে সকলে আমরা  
 প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।’
২. ‘নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো  
 যুগ-জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।  
 সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে  
 নিন্দুক সে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে।  
 নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্বহিতের তরে,  
 আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে।’
- |  |
|--|
| ক. ‘প্রশ়মিতে’— শব্দটির অর্থ কী ?  |
| খ. ‘সংশয়ে সংকল্প সদা টলে’— উভিটি ব্যাখ্যা কর।   |
| গ. উদীপকের প্রথম অংশের বক্তব্য ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কোন স্বকের বিপরীত ভাব<br>ধারণ করেছে? ব্যাখ্যা কর। |
| ঘ. উদীপকের দ্বিতীয় অংশের নিন্দুক ও ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার নিন্দুকের তুলনামূলক<br>আলোচনা কর।            |

## প্রার্থনা

### কায়কোবাদ

বিভো, দেহ হদে বল!  
না জানি তকতি, নাহি জানি স্তুতি,  
কী দিয়া করিব, তোমার আরতি  
আমি নিঃসম্বল!  
তোমার দুয়ারে আজি রিঙ্গ করে  
দাঢ়ায়েছি প্রভো, সঁপিতে তোমারে  
শুধু আঁখি জল,  
দেহ হদে বল!

বিভো, দেহ হদে বল!  
দারিদ্র্য পেষণে, বিপদের ক্ষেত্ৰে,  
অথবা সম্পদে, সুখের সাগৰে  
ভূলি নি তোমারে এক পল,  
জীবনে ঘৰণে, শয়নে স্বপনে  
তুমি মোৱ পথের সম্বল;  
দেহ হদে বল!

বিভো, দেহ হদে বল!  
কত জাতি পাখি, নিকুঞ্জ বিতানে  
সদা আত্মহারা তব গুণগানে,  
আনন্দে বিহ্বল!  
ভুলিতে তোমারে, প্রাণে অবসাদ,  
তরুলতা শিরে, তোমারি প্রসাদ  
চারু ফুল ফল!  
দেহ হদে বল!

বিভো, দেহ হদে বল!  
তোমারি নিঃশ্঵াস বসন্তের বায়ু,  
তব স্নেহ কণা জগতের আয়ু,  
তব নামে অশ্রেষ্ট মঙ্গল!  
গভীর বিষাদে, বিপদের ক্ষেত্ৰে,  
একাগ্র হদয়ে স্মরিলে তোমারে  
নিতে শোকানল!  
দেহ হদে বল!

(সংক্ষেপিত)

## শব্দার্থ ও টীকা

---

প্রার্থনা	- মুনাজাত, আবেদন।
বিভো	- বিভূ, স্মষ্টা, এখানে ‘বিভো’ বলে কবি স্মষ্টাকে সম্বোধন করেছেন।
রিষ্ট করে	- শূন্য হাতে।
পেষণে	- অত্যাচারে।
কেোড়	- কোল।
পল	- মুহূর্তকাল, নিমেষ।
অশেষ	- যার শেষ নেই, অন্তহীন।
বিষাদ	- বিষণ্ণতা, দুঃখবোধ।
স্মরিলে	- স্মরণ করলে, মনে করলে।
প্রসাদ	- অনুগ্রহ।
হদে	- হাদয়ে, মনে।
বল	- শক্তি, জোর।
স্তুতি	- প্রশংসনা।
আরতি	- প্রার্থনা।
চাৰু	- সুন্দর।
নিকুঞ্জ	- বাগান।
শোকানল	- শোকবূপ অনল, যে শোক হৃদয়কে দগ্ধ করে।

## পাঠের উদ্দেশ্য

---

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা স্মষ্টার মহিমা সম্পর্কে জানবে এবং সমগ্র সৃষ্টি যে স্মষ্টার প্রতি নিবেদিত তা উপলক্ষ করবে। তারা স্মষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং সৎ ও সুন্দর জীবন গঠনে তৎপর হবে।

## পাঠ-পরিচিতি

---

‘প্রার্থনা’ কবিতাটি কবির ‘অশুমালা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। কবি এ কবিতায় স্মষ্টার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করে স্মষ্টার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কবি ভক্তি বা প্রশংসনা করতে না জেনেও কেবল চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করেন। বিপদে, আপদে, সুখে, শান্তিতে সব সময় তিনি বিধাতার কাছ থেকে শক্তি কামনা করেন। গাছে গাছে পাখি, বনে বনে ফুল সবই বিধাতাকে ঘরণ করে। তাঁর অফুরন্ত দয়ায় জগতের সব কিছু চলছে। তাঁর কাছেই সকলে সাহায্য প্রার্থনা করে। তাঁর অপার করুণা লাভ করেই বিশ্ব সৎসারের প্রতিটি জীব ও

উদ্বিদ প্রাণধারণ করে আছে। তাঁর দয়া ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না। সুখে-দুখে, শয়নে-স্বপনে তিনি আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা রিস্ক হস্তে পরম ভক্তি ভরে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই : হে প্রভু, আমাদের দেহে ও হৃদয়ে শক্তি দাও। আমরা যেন তোমার আরাধনায় নিজেকে নিবেদন করতে পারি।

### কবি-গব্লিচিতি

কায়কোবাদ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী। প্রবেশিকা পর্যন্ত লেখাপড়া করে তিনি ঢাকা বিভাগে চাকরি নেন। অনেক দিন ধরে তিনি নিজগ্রাম আগলাতে পোস্টমাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন। ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। তারপর আপন স্বভাবে তিনি ক্রমাগত লিখে গেছেন। তাঁর রচিত ‘মহাশুশান’ বিখ্যাত মহাকাব্য। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘অশুমালা’, ‘শিবমন্দির’, ‘অমিয়ধারা’, ‘মহররম শরীফ’ ইত্যাদি। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে কবি কায়কোবাদ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কবি বিধাতাকে কী বলে স্তুতি জানিয়েছেন?

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ক. পথের সম্বল   | খ. চারু ফুল ফল |
| গ. দেহে হৃদে বল | ঘ. অশেষ মঙ্গল  |

২। কেন শব্দটি শুধু?

- |                |              |
|----------------|--------------|
| ক. দারিদ্র্য   | খ. দারিদ্র্য |
| গ. দারিদ্র্যতা | ঘ. দারিদ্রতা |

৩। ‘নিকুঞ্জ’ শব্দটির অর্থ কী?

- |             |           |
|-------------|-----------|
| ক. কুঞ্জলতা | খ. ফুলদল  |
| গ. বাগান    | ঘ. মঞ্জরি |

#### সূজনশীল প্রশ্ন

১. নম্বুশিরে সুখের দিনে

তোমারি মুখ লইব চিনে,

দুখের রাতে নিখিল ধরা

যেদিন করে বথনা

তোমারে যেন না করি সংশয়।

ক. স্তুতি কথার অর্থ কী?

খ. ‘তোমার দুয়ারে আজি রিস্ক করে’ বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্বীপকের সঙ্গে ‘প্রার্থনা’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্বীপকটি ‘প্রার্থনা’ কবিতার একটি বিশেষ দিককে নির্দেশ করলেও সমগ্রতাব প্রকাশে সক্ষম নয় –  
যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

## ବାବୁରେର ମହତ୍ତ୍ଵ

କାଲିଦାସ ରାୟ

ପାଠାନ-ବାଦଶା ଲୋଦି

ପାନିପଥେ ହତ । ଦଖଳ କରିଯା ଦିଲ୍ଲିର ଶାହିଗନ୍ଦି,  
ଦେଖିଲ ବାବୁର ଏ-ଜୟ ତାହାର ଫାଁକ,  
ଭାରତ ଯାଦେର ତାଦେର ଜିନିତେ ଏଥନେ ରଯେଛେ ବାକି ।  
ଗର୍ଜିଯା ଉଠିଲ ସଂଘାମ ସିଂ, ‘ଜିନେଛ ମୁସଲମାନ,  
ଜୟୀ ବଲିବ ନା ଏ ଦେହେ ରହିତେ ଥାଣ ।

ଲୟେ ଲୁଣ୍ଠିତ ଧନ  
ଦେଶେ ଫିରେ ଯାଓ, ନତୁବା ମୁଘଳ, ରାଜପୁତେ ଦାଓ ରଣ ।’

ଥାନୁଯାର ପ୍ରାନ୍ତରେ  
ମେଇ ସିଂହେରୋ ପତନ ହଇଲ ବୀର ବାବୁରେର କରେ ।  
ଏ ବିଜଯ ତାର ସ୍ଵପ୍ନ-ଅତୀତ, ଯେନ ବା ଦୈବ ବଲେ  
ସାରା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆସିଲ ବିଜଯୀର କରତଳେ ।

କବରେ ଶାଯିତ କୃତୟ ଦୌଲତ,  
ବାବୁରେର ଆର ନାଇ କୋନୋ ପ୍ରତିରୋଧ ।  
ଦମ୍ଭୁର ମତୋ ତୁଷ୍ଟ ନା ହେଁ ଲୁଣ୍ଠିତ ସମ୍ପଦେ,  
ଜାକିଯା ବସେଛେ ମୁଘଳ ସିଂହ ଦିଲ୍ଲିର ମସନଦେ ।  
ମାଟିର ଦଖଳଇ ଖାଟି ଜୟ ନୟ ବୁଝେଛେ ବିଜଯୀ ବୀର,  
ବିଜିତେର ହନ୍ଦି ଦଖଳ କରିବେ ଏଥନ କରେଛେ ସ୍ଥିର ।

ପ୍ରଜାରଙ୍ଗନେ ବାବୁର ଦିଆଛେ ମନ,  
ହିନ୍ଦୁର-ହନ୍ଦି ଜିନିବାର ଲାଗି କରିତେଛେ ସୁଶାସନ,  
ଧରିଯା ଛାନ୍ଦବେଶ

ଘୁରି ପଥେ ପଥେ ଖୁଜିଯେ ପ୍ରଜାର କୋଥାଯ ଦୁଃଖ କ୍ରେଶ ।  
ଚିତୋରେର ଏକ ତରଣ ଯୋନୀ ରଣବୀର ଚୌହାନ  
କାରିତେଛେ ଆଜି ବାବୁରେର ସନ୍ଧାନ,  
କୁର୍ତ୍ତାର ତଳେ କୃପାଗ ଲୁକାୟେ ଘୁରିଛେ ସେ ପଥେ ପଥେ  
ଦେଖା ଯଦି ତାର ପାଯ ଆଜି କୋନୋ ମତେ

ଲାଇବେ ତାହାର ଥାଣ,  
ଶୋଗିତେ ତାହାର କ୍ଷାଲିତ କରିବେ ଚିତୋରେର ଅପମାନ ।

ଦାଁଡ଼ାୟେ ଯୁବକ ଦିଲ୍ଲିର ପଥ-ପାଶେ  
ଲକ୍ଷ କରିଛେ ଜନତାର ମାବୋ କେବା ଯାଯ କେବା ଆସେ ।

ହେନ କାଳେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ହଞ୍ଚି ଛୁଟିଲ ପଥେର ପରେ  
ପଥ ଛାଡ଼ି ସବେ ପଲାଇୟା ଗେଲ ଡରେ ।

ସକଳେଇ ଗେଲ ସରି  
କେବଳ ଏକଟି ଶିଶୁ ରାଜପଥେ ରାହିଲ ଧୂଲାୟ ପଡ଼ି ।

হাতির পায়ের চাপে  
 ‘গেল গেল’ বলি হায় হায় করি পথিকেরা ভয়ে কাঁপে।  
 ‘কুড়াইয়া আন ওরে’  
 সকলেই বলে অথচ কেহ না আগায় সাহস করে।  
 সহসা একটি বিদেশি পুরুষ ভিড় ঠেলে যায় ছুটে,  
 ‘কর কী কর কী’ বলিয়া জনতা চিঢ়কার করি উঠে।  
 করি-ওগের ঘর্ষণ দেহে সহি  
 পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি  
 ফিরিয়া আসিল বীর।  
 চারি পাশে তার জমিল লোকের ভিড়।  
 বলিয়া উঠিল এক জন, ‘আরে এ যে মেখ্বের ছেলে,  
 ইহার জন্য বে-আকুফ তুমি তাজা প্রাণ দিতে গেলে?  
 খুদার দয়ায় পেয়েছ নিজের জান,  
 ফেলে দিয়ে ওরে এখন করগে স্নান।’  
 শিশুর জননী ছেলে ফিরে পেয়ে বুকে  
 বক্ষে চাপিয়া চুমু দেয় তার মুখে।  
 বিদেশি পুরুষে রাজপুত বীর চিনিল নিকটে এসে,  
 এ যে বাদশাহ স্বয়ং বাবুর পর্যটকের বেশে।  
 ভাবিতে লাগিল, ‘হরিতে ইহারই প্রাণ  
 পথে পথে আমি করিতেছি সন্ধান?  
 বাবুরের পায়ে পঢ়ি সে তখন লুটে  
 কহিল সঁপিয়া গুণ্ঠ কৃপাণ বাবুরের করপুটে,-  
 ‘জাহাপনা, এই ছুরিখানা দিয়ে আপনার প্রাণবধ  
 করিতে আসিয়া একি দেখিলাম! ভারতের রাজপদ  
 সাজে আপনারে, অন্য কারেও নয়।  
 বীরভোগ্যা এ বসুধা এ কথা সবাই কয়,  
 ভারত-ভূমির যোগ্য পালক যেবা,  
 তাহারে ছাড়িয়া, এ ভূমি অন্য কাহারে করিবে সেবা?  
 কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অঙ্গ মোহের ঘোর,  
 সঁপিনু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর।’  
 রাজপথ হতে উঠায়ে যুবকটিরে  
 কহিল বাবুর ধীরে,  
 ‘বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে;  
 জান না কি ভাই? ধন্য হলাম আজিকে তোমারে পেয়ে  
 আজি হতে মোর শরীর রক্ষী হও;  
 প্রাণ-রক্ষকই হইলে আমার, প্রাণের ঘাতক নও।’

### শব্দার্থ ও টীকা

---

হত	- নিহত।
শাহিগদি	- বাদশার গদি, সিংহাসন।
জিনিতে	- জয় করতে।
রণ	- যুদ্ধ।
প্রাম্তন	- বিস্তৃত মাঠ, ময়দান।
স্বপ্ন-অতীত	- স্বপ্নের অতীত, যা স্বপ্নেও দেখা যায় না, অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়।
করতল	- হাতের তালু।
প্রতিরোধ	- বাধা।
তৃষ্ণ	- তৃণ, আনন্দিত, খুশি।
মসনদ	- সিংহাসন, রাজাসন।
করি-শুভ	- হাতির শুভ।
বে-আকুফ	- নির্বোধ।
পর্যটক	- ভ্রমণকারী।
কৃগাণ	- ছোট তরবারি, খড়গ
বসুধা	- পৃথিবী।
ঘাতক	- হত্যাকারী।
দণ্ডবিধান	- শাস্তি প্রদান।

বাবুর- ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট। তাঁর আসল নাম জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ। তবে তিনি 'বাবুর' বা 'সিংহ' নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে মধ্য-এশিয়ার সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহন করেন এবং অল্প বয়সেই দু'বার সিংহাসন হারান। তারপর তিনি নিজ দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানের সিংহাসন অধিকার করেন এবং পরে ভারতের ইরাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি অধিকার করেন। মেবারের রাজা সংগ্রাম সিংহকে তিনি পরাজিত করেন। এভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বাবুর।

**পাঠান বাদশা লোদি-** ভারতের লোদি বংশীয় শেষ পাঠান-সম্রাট সুলতান ইরাহিম লোদি।

**পানিপথ-** দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে তিনটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

**সংগ্রাম সিংহ-** রাজপুতানার অন্তর্গত মেবার রাজ্যের অধিপতি রাজা সংগ্রাম সিংহ। তিনি খানুয়ার প্রান্তরে বাবুরের কাছে পরাজিত হন।

**খানুয়ার প্রান্তর-** আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত যুদ্ধক্ষেত্র।

**কৃতল্ল দৌলত-** বাবুরের ভারত আক্রমণকালে দৌলত খাঁ লোদি পাঞ্জাবের শাসক ছিলেন। তিনি নিজের দুশ্মন ইরাহিম লোদির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাবুরকে ভারত আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন। পরে তিনি বাবুরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

**চিঠোর— রাজপুতানার মেবার রাজ্যের রাজধানী।**

**রণবীর চৌহান— রাজপুত জাতির একটি প্রাচীন শাখার নাম চৌহান। যে স্বদেশপ্রেমিক রাজপুত যুবক বাবুরকে হত্যা করতে চেয়েছিল তাকে বলা হয়েছে ‘রণবীর চৌহান’।**

### **পাঠের উদ্দেশ্য**

কবিতাটি পাঠ করার মাধ্যমে সন্মাট বাবুরের মহানুভবতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে। তারা মহৎ আদর্শে অনুগ্রামিত হবে এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে।

### **পাঠ-পরিচিতি**

‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতাটি কালিদাস রায়ের ‘পর্ণপুট’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ কবিতায় মুঘলসন্মাট বাবুরের মহানুভবতা বর্ণিত হয়েছে। এতে তাঁর মহৎ আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ তুলে ধরা হয়েছে। ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সন্মাট বাবুর। রাজ্য বিজয়ের পর তিনি প্রজা সাধারণের হন্দয় জয়ে মনোযোগী হলেন। রাজপুতগণ তাঁকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। রাজপুত-বীর তরুণ রণবীর চৌহান বাবুরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দিল্লির রাজপথে ঘূরছিল। এমন সময় বাবুর নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে মন্ত্র হাতির কবল থেকে রাজপথে পড়ে-থাকা একটি মেথর শিশুকে উদ্ধার করেন। রাজপুত যুবক বাবুরের মহত্ত্বে বিস্মিত হয়। সে বাবুরের পায়ে পড়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে। মহৎপ্রাণ বাবুর তাকে ক্ষমা করেন এবং তাকে নিজের দেহরস্থী নিয়োগ করেন।

### **কবি-পরিচিতি**

কালিদাস রায় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কড়ই গ্রামে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকে তিনি আদর্শ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য সাধনায় ব্যাপ্ত ছিলেন। তিনি বিচিত্র বিষয়ের ওপর কবিতা লিখেছেন। তিনি বেশ কিছুসংখ্যক কাহিনি-কবিতা রচনা করেন। তিনি তাঁর কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। কবি হিসেবে স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ‘কবিশেখর’ উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে। কালিদাস রায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্য : ‘কিশলয়’, ‘পর্ণপুট’, ‘বন্ধুরী’, ‘খতুমঙ্গল’, ‘রসকদম্ব’ ইত্যাদি। তিনি ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

### **নমুনা প্রশ্ন**

#### **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১. ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতাটি কালিদাস রায়ের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
 

ক. কিশলয়	খ. পর্ণপুট
গ. খতুমঙ্গল	ঘ. বৈকালী

২. ‘জয়ী বলিব না এ দেহে রহিতে থান ।’ কে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল?
- ক. চৌহান
  - খ. সংগ্রাম সিং
  - গ. দৌলত খাঁ
  - ঘ. ইব্রাহিম লোদি
৩. ‘বীরভোগ্যা এ সুবিধা’- এ কথার অর্থ কী?
- ক. বীরপুরষেরাই এ পৃথিবীতে মর্যাদা পেয়ে থাকেন
  - খ. বীরপুরষগণই পৃথিবীতে কীর্তি স্থাপন করে থাকেন
  - গ. বীরগণ পৃথিবীকে বেশি ভোগ করেন
  - ঘ. এ পৃথিবীতে বীরের অধিকারই স্বীকৃত
৪. বাবুরের মহত্ত্ব কবিতায় ফুটে উঠেছে বাবুরের-
- i. ক্ষমাশীলতা
  - ii. বীরত্ব
  - iii. মহানুভবতা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i
  - খ. i ও ii
  - গ. iii
  - ঘ. i, ii ও iii

নিচের চরণ দুটো পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অঙ্গ মোহের ঘোর,

সঁপিনু জীবন, কর্মন এখন দণ্ডবিধান মোর ।’

৫. কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অঙ্গ মোহের ঘোর, কার প্রতিহিংসার ঘোর কেটেছে?
- ক. চৌহানের
  - খ. সংগ্রাম সিং-এর
  - গ. দৌলত খাঁ-এর
  - ঘ. ইব্রাহিম লোদির
৬. ‘কর্মন এখন দণ্ডবিধান মোর’- কিসের দণ্ডবিধানের কথা এখানে বলা হয়েছে?
- i. প্রতিহিংসার
  - ii. অঙ্গ মোহের
  - iii. অপরাধের
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i
  - খ. i ও ii
  - গ. iii
  - ঘ. i, ii ও iii

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. প্রচণ্ড বন্যায় ঢুবে যায় টাঙ্গাইলের ব্যাপক অঞ্চল। অনেকেরই ঘর-বাড়ি ঢুবে যায়। নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে অগণিত মানুষ। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এমনি একটা পরিবার নৌকায় ঢড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে। তীব্র স্ন্যাতের টামে নৌকাটি উল্টে গেলে সবাই সাঁতার কেটে উঠে এলেও জলে ঢুবে যায় একটি শিশু। বড় মিয়া নামের এক যুবক এ দৃশ্য দেখে ঝাপিয়ে পড়ে উদ্বার করেন শিশুটিকে। কুলে উঠে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ডাক্তার এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানালেন বড় মিয়া আর বেঁচে নেই।
  - ক. রনবীর চৌহান কে ছিলেন?
  - খ. ‘বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে।’ কেন?
  - গ. উদ্বীপকে বর্ণিত বড় মিয়া আচরণে ‘বাবুরের মহস্ত’ কবিতায় ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর।
  - ঘ. উদ্বীপকটিতে ‘বাবুরের মহস্ত’ কবিতার একটা বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটলেও সমভাব ধারণ করে না – যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ।
২. “বাঁচিতে চাই না আর  
 জীবন আমার সঁপিলাম, পীর, পৃত পদে আপনার।  
 ইত্রাহীমের গুণ্ঠাতক আমি ছাড়া কেউ নয়,  
 এ অসিখানা এ বুকে হানুন সত্ত্বের হোক জয়।”
  - ক. বাবুর- এর আসল নাম কী?
  - খ. ‘সঁপিলু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর’। – উক্তিটি কার, কেন?
  - গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত ইত্রাহীমের গুণ্ঠাতকের সাথে ‘বাবুরের মহস্ত’ কবিতায় বর্ণিত রাজপুত বীরের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।
  - ঘ. উদ্বীপকটি ‘বাবুরের মহস্ত’ কবিতার সমগ্র ভাব প্রকাশে কতটুকু সক্ষম তা যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে বল।

# ନାରୀ

କାଜି ନଜରୁଲ ଇସଳାମ

ସାମ୍ୟେର ଗାନ ପାଇ—

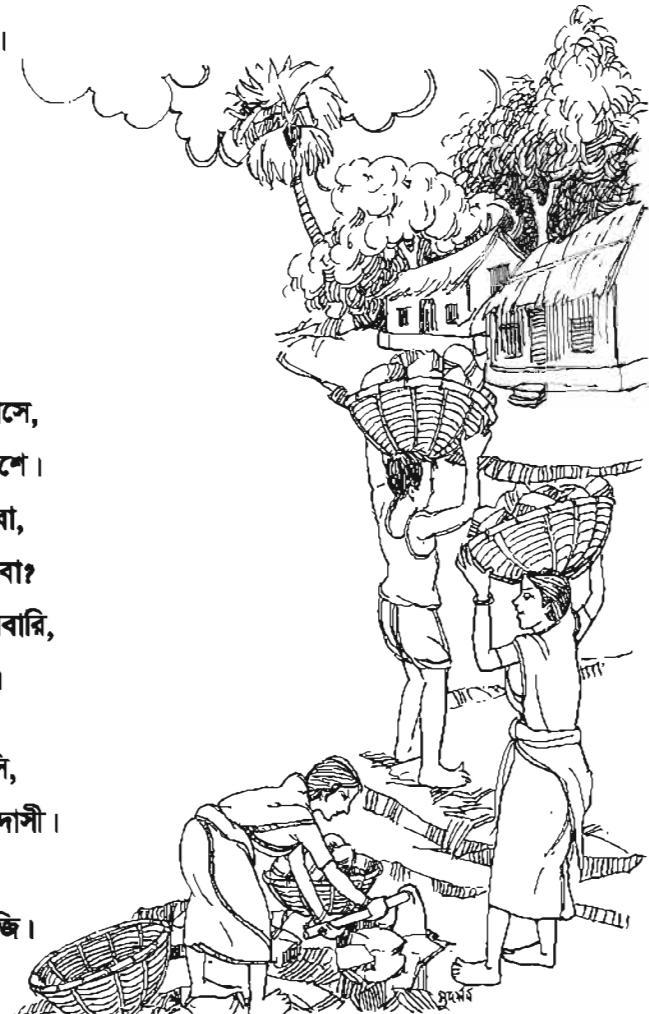
ଆମାର ଚଙ୍କେ ପୂରୁଷ-ରମଣୀ କୋନୋ ଡେଦାନ୍ତେଦ ନାହିଁ ।  
 ବିଶ୍ଵେ ଯା-କିଛୁ ମହାନ ସୃତି ଚିର-କଲ୍ୟାଣକର  
 ଅର୍ଧେକ ତାର କରିଯାଇଛେ ନାରୀ, ଅର୍ଧେକ ତାର ନର ।  
 ବିଶ୍ଵେ ଯା-କିଛୁ ଏହି ପାପ-ତାପ ବେଦନା ଅଳ୍ପବାରି  
 ଅର୍ଧେକ ତାର ଆନିଯାଇଛେ ନର, ଅର୍ଧେକ ତାର ନାରୀ ।  
 ଜଗତେର ସତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିଧାନ  
 ମାତା ଭଗ୍ନି ଓ ବଖୁଦେର ତ୍ୟାଗେ ହଇଯାଇଛେ ଯହୀଯାନ ।  
 କୋନ ରାଗେ କତ ଥୁନ ଦିଲ ନର, ଲେଖା ଆହେ ଇତିହାସେ,  
 କତ ନାରୀ ଦିଲ ସିଦ୍ଧିର ସିଦ୍ଧି, ଲେଖା ନାହିଁ ତାର ପାଶେ ।  
 କତ ମାତା ଦିଲ ହଦୟ ଉପାଡ଼ି କତ ବୋନ ଦିଲ ସେବା,  
 ବୀରେର ଶୃତି-ଶତ୍ରୁର ଗାୟେ ଶିଥିଯା ରେଖେହେ କେବା ?  
 କୋନୋ କାଳେ ଏକା ହୟ ନି କୋ ଜୟା ପୁରୁଷେର ତତ୍ତ୍ଵବାରି,  
 ପ୍ରେରଣା ଦିଯାଇଛେ, ଶକ୍ତି ଦିଯାଇଛେ ବିଜୟ-ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରୀ ।

ସେ-ସୁଗ୍ରେ ହେଯେହେ ବାସି,  
 ସେ ସୁଗ୍ରେ ପୁରୁଷ ଦାସ ଛିଲ ନା କୋ, ନାରୀଙ୍କା ଆହିଲ ଦାସି ।  
 ବେଦନାର ସୁଗ୍ରେ, ମାନୁଷେର ସୁଗ୍ରେ, ସାମ୍ୟେର ସୁଗ୍ରେ ଆଜି,  
 କେହ ମହିବେ ନା ବନ୍ଦୀ କାହାରଙ୍ଗ, ଉଠିଛେ ଡଙ୍କା ବାଜି ।  
 ନର ଯଦି ରାଖେ ନାରୀରେ ବନ୍ଦୀ, ତବେ ଏହ ପର ସୁଗ୍ରେ  
 ଆପନାରି ରଚା ଏହି କାରାଗାରେ ପୁରୁଷ ମରିବେ ଭୁଗେ ।

ସୁଗ୍ରେର ଧର୍ମ ଏହି—

ପୀଡ଼ନ କରିଲେ ସେ-ପୀଡ଼ନ ଏସେ ପୀଡ଼ା ଦେବେ ତୋଯାକେଇ !

[ସଂକ୍ଷେପିତ]



## শব্দার্থ ও টীকা

---

সাম্য	— সমতা, সমান অধিকার ।
অশুবারি	— চোখের জল ।
ভয়ি	— বোন ।
মহীয়ান	— সুমহান, এখানে মহিমান্বিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।
রণ	— যুদ্ধ, লড়াই ।
কত নারী	— অসংখ্য নারী স্বামীকে হারিয়েছে ।
কত মাতা	— হৃদয়তরা মমতা দিয়ে উৎসাহিত করল নারী ।
সৃতিস্তুত	— সৃতি রক্ষার্থে তৈরি কাঠামো ।
বিজয়-লক্ষ্মী নারী	— জয়ের নিয়ন্তা দেবী হিসেবে নারীকে কঞ্জনা করা হয়েছে ।
ডঙ্কা	— জয়চাক ।
রচা	— রচনা করা হয়েছে এমন, সৃষ্টি করা হয়েছে এমন ।
পীড়ন	— অত্যাচার, নির্যাতন, শারীরিক কষ্ট প্রদান ।
পীড়া	— যন্ত্রণা, কষ্ট, বেদন ।

## পাঠের উদ্দেশ্য

---

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নারীর প্রতি শুন্দৰাশীল হবে। মানব সভ্যতায় নারীর অবদান যে পুরুষের চেয়ে কম নয় তা জেনে নারীর অধিকারের প্রতি সচেতন হবে।

## পাঠ-পরিচিতি

---

‘নারী’ কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের ‘সাম্যবাদী’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। সাম্যবাদী কবি ‘নর-নারী’ উভয়কেই মানুষ হিসেবে দেখেন। তিনি জগতে নর ও নারীর সাম্য বা সমান অধিকারে আস্থাবান। তাঁর মতে, পৃথিবীতে মানবসভ্যতা নির্মাণে নারী ও পুরুষের অবদান সমান। কিন্তু ইতিহাসে পুরুষের অবদান যতটা লেখা হয়েছে নারীর অবদান ততটা লেখা হয় নি। কিন্তু এখন দিন এসেছে সম অধিকারের। তাই নারীর ওপর নির্যাতন চলবে না, তাঁর অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। নারী-পুরুষ সবাইকে সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে হবে সম্মিলিতভাবে।

## কবি-পরিচিতি

---

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করতে পারেন নি। দশম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্কুল ছেড়ে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। যুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়। নজরুল কলকাতায় ফিরে এসে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় সাংগীতিক ‘বিজলী’ পত্রিকায় তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি প্রকাশিত হলে চারদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কবিতায় পরাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উচ্চারিত হয়েছে। অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ করেন। এজন্য তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। তাঁর রচনাবলি অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৩ কবিতা, সংগীত, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গল্প—সাহিত্যের সকল শাখায় আমরা তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় পেয়ে থাকি। তিনি সাম্যবাদী চেতনাভিত্তিক কবিতা, শ্যামাসংগীত, ইসলামি গান ও গজল লিখে প্রশংসা

পেয়েছেন। তিনি আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে কুশলতা দেখিয়েছেন। দুর্ভাগ্য যে, মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তার সাহিত্যসাধনায় ছেদ ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে কবিকে সপরিবারে ঢাকায় আনা হয়। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব এবং একুশে পদক পান। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে, কাব্যগ্রন্থ : ‘অগ্নি-বীণা’, ‘বিষের বাঁশী’, ‘সাম্যবাদী’, ‘সর্বহারা’, ‘সিঙ্গু-হিন্দোল’, ‘চক্ৰবাক’; উপন্যাস : ‘মৃত্যুক্ষুধা’, ‘কুহেলিকা’; গল্পগ্রন্থ : ‘ব্যথার দান’, ‘রিজের বেদন’ ‘শিউলিমালা’; প্রবন্ধগ্রন্থ : ‘ঘগবাণী’, ‘রুদ্র-মঙ্গল’; নাটক : ‘বিলিমিলি’, ‘আলেয়া’, ‘মধুমালা’ ইত্যাদি। কবি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

କର୍ମ-ଅନୁଶୀଳନ

- ক. তোমার পরিচিতজনদের মধ্যে এমন কোনো নারীর জীবনালেখ্য রচনা কর— যার কর্মজগৎ নিয়ে  
তুমি গর্ব করতে পার (একক কাজ)।

খ. নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদের স্বরূপ চিহ্নিত করার জন্য তোমার সহপাঠীদের মধ্যে একটি  
গবেষণা চালাতে পার। এর জন্য শিক্ষকের সহযোগিতায় প্রথমেই প্রশ্নমালা তৈরি করতে হবে।  
যেমন— ১.সংসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কে? উত্তর হতে পারে নারী, পুরুষ, অথবা উভয়ই।

ନୟନୀ ପ୍ରଶ୍ନ

ବହୁନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ଳମ



## নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii  
গ. ii ও iii

### নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

লোকশিল্পী কাঙালিনী সুফিয়া জীবিকার তাগিদে কোদাল-টুকরি নিয়ে পুরুষ শ্রমিকদের সাথে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটি কাটেন। দিন শেষে মজুরি নিতে গিয়ে দেখেন পুরুষ শ্রমিকদের দেওয়া হচ্ছে দু-শ টাকা আর তাকে দেওয়া হলো একশ টাকা। এর কারণ জিজেস করলে মালিক বলে— এটাই নিয়ম!

৪. প্রদত্ত উদ্দীপকটির সাথে ‘নারী’ কবিতার ভাবগত ঐক্যের দিকটি হলো—

- i. বৈষম্য
- ii. শোষণ
- iii. সাম্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. উদ্দীপকের ভাব নিচের কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে ?

- ক. অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর
- খ. কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে
- গ. বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি
- ঘ. কোন কালে একা হয় নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. নারীদের প্রেরণাদায়ক একটি নাম আনোয়ারা। একজন নারী হয়ে জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাচন- সংক্রান্ত কাজ করেছেন। সম্প্রতি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মতো বিশাল কর্মসূজ্জ তিনি কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করেছেন। রিটার্নিং অফিসার হিসেবে তিনি অন্য পুরুষ সহকারীদের কাছ থেকে যথাযথ সাহায্য- সহযোগিতা পেয়েছেন। নারী বলে কোথাও তাকে সমস্যায় পড়তে হয় নি।

- ক. ‘নারী’ কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত ?
- খ. কবি বর্তমান সময়কে ‘বেদনার যুগ’ বলতে কী বুঝিয়েছেন ?
- গ. আনোয়ারার কার্যক্রমে ‘নারী’ কবিতার যে দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে তার বর্ণনা দাও।
- ঘ. উদ্দীপকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুভূতির প্রতিফলন ঘটলেও ‘নারী’ কবিতায় কবি আরও বেশি বাজায় – বন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

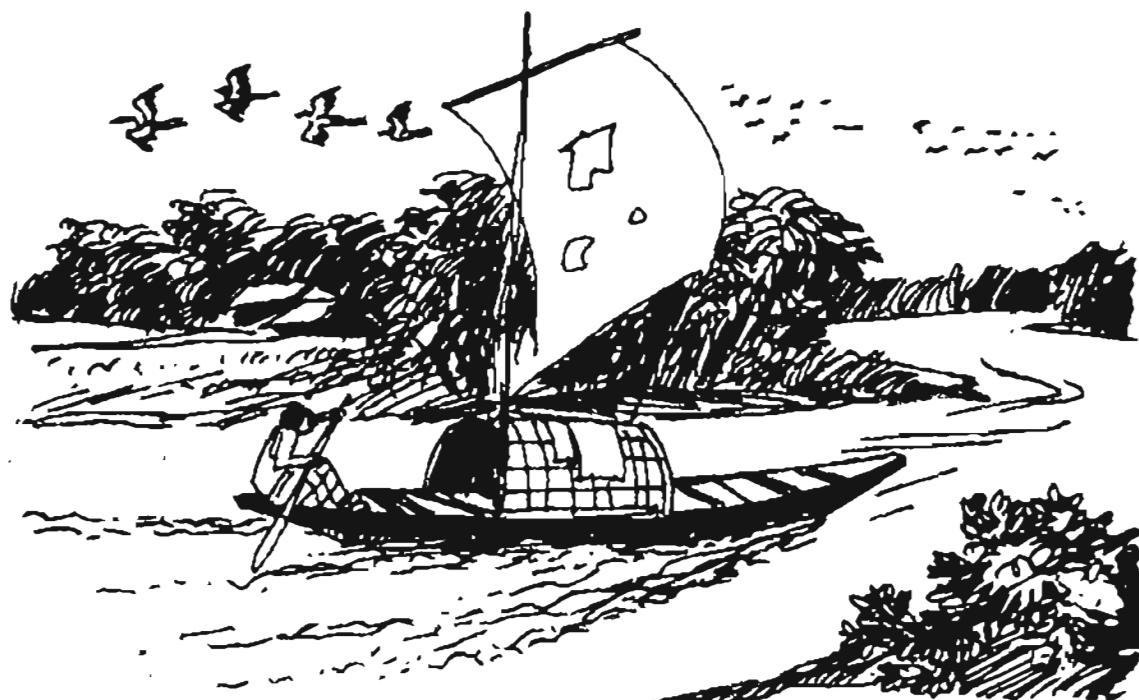
২. জনেক সমালোচকের মতে— ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গীয় মুসলমান নারীসমাজ ছিল অঙ্গতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় বিধি- নিষেধের নিগড়ে আবন্ধ। নিরক্ষরতা, অশিক্ষা ও সামাজিক ভেদ-বুদ্ধি ও ছিল তাদের জন্য নিয়তির মতো সত্য। অবরুদ্ধ জীবন-যাপনে অভ্যন্ত এক অসহায় জীবে তারা পরিণত হয়েছিলেন। এদেরকে আলোর জগতে আনার জন্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর বক্তব্য— ‘আমরা সমাজেরই অর্ধাঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীভাবে? কোন এক পা বাধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে— একই।’
- ক. ‘বিজয়-লক্ষ্মী নারী’— অর্থ কী ?
- খ. ‘সাম্যের গান’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন ?
- গ. জনেক সমালোচকের মতটি ‘নারী’ কবিতার কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ—ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বেগম রোকেয়ার বক্তব্য যেন কাজী নজরুল ইসলামের ‘নারী’ কবিতারই প্রতিধ্বনি— উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

## আবার আসিব ফিরে

জীবননন্দ দাশ

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়  
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;  
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে  
কুঁঢ়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছাইয়া;  
হয়তো বা হাঁস হবো— কিশোরীর ঘূঞ্জুর রহিবে লাল পায়,  
সারাদিন কেটে ষাবে কলমির গন্ধকরা জলে ভেসে ভেসে;  
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে  
জলাঞ্জীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সম্ম্যার বাতাসে;  
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ভাকিতেছে শিমুলের ডালে;  
হয়তো ঝইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;  
বৃপ্সার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে  
ডিঙা বায়;— রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অশ্বকারে আসিতেছে নীড়ে  
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে ভূমি ইহাদের ভিড়ে—



### শব্দার্থ ও টীকা

ধানসিডি	— ঝালকাঠি জেলার একটি নদী। নদীটি এখন মরে গেছে।
শঙ্খচিল	— এক ধরনের সাদা চিল।
নবান্ন	— নতুন ধানকাটার পর আমাদের দেশে এ উৎসব হয়। এ উৎসবে দুধ, গুড়, নারকেলের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন আতপ চালের ভাত খাওয়া হয়।
কার্তিকের নবান্নের দেশে	— কবি নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশকে নবান্নের দেশ বলেছেন। নবান্ন অর্থ নতুন ভাত। কার্তিক মাসে ঘরে নতুন ধান তুলে কৃষকেরা নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে।
মুগুর	— মুগুর, পায়ের অলংকার।
জলাঞ্জী	— কবি এখানে নদীকে জলাঞ্জী (অর্থাৎ জল যার অঙ্গ) নামে অভিহিত করেছেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশকে কবি জলাঞ্জীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলা বলেছেন।
ডাঙা	— জলাশয়ের নিকটবর্তী উঁচু ছান।
সুদর্শন	— শকুনি।
লক্ষ্মীপেঁচা	— এক ধরনের পেঁচা।
রূপসা	— একটি নদীর নাম।
ডিঙা	— ছোট নৌকা।
নীড়ে	— পাথির বাসায়।
ধ্বল	— সাদা।

### পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলার প্রকৃতির রূপৈচিত্রের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে। তাদের মনে নিজের দেশের প্রতি মমতাবোধের জাগরণ ঘটবে।

### পাঠ-পরিচিতি

‘আবার আসিব ফিরে’ কবিতাটি কবির ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। জন্মভূমির অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস কবির দৃষ্টিতে সুন্দর হয়ে ধরা পরেছে কবিতায়। কবি মনে করেন, যখন তাঁর মৃত্যু হবে তখন দেশের সঙ্গে তাঁর মমতার বাঁধন শেষ হবে না। তিনি বাংলার নদী, মাঠ, ফসলের খেতকে ভালোবেসে শঙ্খচিল বা শালিকের বেশে এদেশে ফিরে আসবেন। আবার কখনও বা ভোরের কাক হয়ে কুয়াশায় মিশে যাবেন। এমনও হতে পারে, তিনি হাঁস হয়ে সারাদিন কলমির গম্বে ভরা বিলের পানিতে ভেসে বেড়াবেন। এমনকি দিনের শেষে যে সাদা বকের দল মেঘের কোল যেঁমে নীড়ে ফিরে আসে তাদের মাঝেও কবিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এভাবে তিনি বাংলাদেশের রূপময় প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাবেন।

### **কবি-পরিচিতি**

কবি জীবননন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয় এবং তিনি বিভিন্ন সময়ে কলকাতা সিটি কলেজ, দিল্লি রামযশ কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, খড়গপুর কলেজ, বরিশা কলেজ ও হাওড়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। এক সময় তিনি সাংবাদিকতার পেশাও অবলম্বন করেছিলেন। জীবননন্দ দাশের কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতির রং ও রূপের বৈচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। অনেক অজানা গাছ, পশু-পাখি ও লাতাপাতা তাঁর কবিতায় নতুন পরিচয়ে ধরা পড়েছে। প্রকৃতিপ্রেমিক এই কবি প্রকৃতি থেকেই তাঁর কবিতার রূপরস সংগ্রহ করেছেন। কবিতা ছাড়াও তিনি গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি ১৯৫৪ সালে কলকাতায় এক ট্রাম দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

### **কর্ম-অনুশীলন**

- ক. কবিতাটির দৃশ্যচিত্র অবলম্বনে একটি চিত্রাঞ্জন প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (গ্রেপ্তির সকল শিক্ষার্থীর অংশ প্রযোজনে)।
- খ. ‘আবার আসিব ফিরে’ কবিতাটি অবলম্বনে একক ও দলগত আবৃত্তির আয়োজন কর।

### **নমুনা প্রশ্ন**

#### **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১. ধানসিঙ্গি কিসের নাম ?
 

ক. নদীর	খ. শহরের
গ. ধানের	ঘ. গ্রামের
২. ‘আবার আসিব ফিরে’ কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে ?
 

ক. ধূসর পাত্রুলিপি	খ. রূপসী বাংলা
গ. বারাপালক	ঘ. বনলতা সেন
৩. ‘সারাদিন কেটে যাবে কলমির গম্ভভরা জলে ভেসে ভেসে’—এখানে সারাদিন কেটে যাবে কার ?
 

ক. হাঁসের	খ. কিশোরীর
গ. কাকের	ঘ. কবির

#### **কবিতাংশ্টি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

‘গোধুলি লগনে জগদীশে ঘৰণে  
বিদায় লইব জনমের তরে  
লুকাইব আমি সন্ধ্যার আঁধারে বাংলা মায়ের ক্ষোড়ে ॥’

৪. উদ্দীপকে ‘আবার আসিব ফিরে’ কবিতার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে ?
 

ক. স্বদেশচেতনা	খ. মৃত্যুচেতনা
গ. প্রকৃতিচেতনা	ঘ. ধর্মচেতনা

৫. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি উক্তসিত হয়েছে নিচের কোন চরণে ?

- i. আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়
- ii. হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সম্ম্যার বাতাসে
- iii. আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ থেকে ভালোবেসে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |    |          |    |             |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii   | খ. | i ও iii     |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. পল্লির সন্তান অমিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার্থে ফ্রাঙ যায়। সেখানকার সুপ্রশংস্ত রাজপথ, উদ্যান, নির্মল প্রকৃতি তার খুব ভালো লাগে। রাস্তাঘাট, রেলস্টেশন, বাস-স্টপেজ সব জায়গায় দেশি-বিদেশি স্বর্গীয় ব্যক্তিবর্গের মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে ফরাসিদের দেশপ্রেম দেখে সে বিস্মিত হয়। ওদের ক্যাফে, মিউজিয়াম সবকিছুই তাকে আকৃষ্ট করে। উচ্চশিক্ষা শেষ করে অমিত স্থায়ভাবে সেখানে থেকে যায়। তার অতীত স্মৃতি ফরাসি সৌন্দর্যের মোহে ক্রমশ ধূসর হয়ে যায়।

ক. উঠানে খইয়ের ধান ছড়ায় কে ?

খ. মানুষ না হয়ে শঙ্খচিল, শালিকের বেশে জীবনানন্দ দাশ এদেশে ফিরতে চান কেন ?

গ. ‘আবার আসিব ফিরে’ কবিতায় উদ্বীপকের ফরাসি জাতির কোন দিকটির প্রতি ইঞ্জিত করে ?  
বর্ণনা কর।

ঘ. অমিতের অনুভূতি আর জীবনানন্দ দাশের অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন—উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২. ‘বাংলার হাওয়া বাংলার জল  
হৃদয় আমার করে সুশীতল  
এত সুখ শান্তি এত পরিমল  
কোথা পাব আর বাংলা ছাড়া ’

ক. ‘আবার আসিব ফিরে’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে ?

খ. ‘বাংলার সবুজ করুণ ডাঙা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

গ. উদ্বীপক অবলম্বনে ‘আবার আসিব ফিরে’ কবিতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

ঘ. ‘কোথা পাব আর বাংলা ছাড়া’—কথাটির সঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশের বাংলায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা কীভাবে সম্পর্কিত— আলোচনা কর।

# ବୁପାଇ

## ଜୟୀମତ୍ତଦୂମୀନ

ଏই ଗୌରେ ଏକ ଚାବାର ଛେଲେ ଲଧା ମାଥାର ଚଳ,  
କାଳୋ ମୁଖେଇ କାଳୋ ଅମର, କିସେର ରଙ୍ଗିନ ଫୁଲ!  
କୁଠା ଧାନେର ପାତାର ମତୋ କଟି-ମୁଖେର ମାଯା,  
ତାର ସାଥେ କେ ମାଖିଯେ ଦେହେ ନବୀନ ତୃଣେର ଛାଯା ।  
ଆଖି ଲାଉରେର ଡଗାର ମତୋ ବାହୁ ଦୁଖାନ ସର୍କ,  
ଗା ଖାନି ତାର ଶାନ୍ତିନ ମାସେର ସେମନ ତମାଳ ତରୁ ।  
ବାଦଳ-ଧୋରା ମେଘେ କେ ଗୋ ମାଖିଯେ ଦେହେ ତେଳ,  
ବିଜଳି ମେଘେ ପିଛଲେ ପଡ଼େ ଛଡ଼ିଯେ ଆଲୋର ଖେଳ ।  
କଟି ଧାନେର ତୁଳତେ ଚାରା ହସତୋ କୋନୋ ଚାଷ,  
ମୁଖେ ତାହାର ଜଡ଼ିଯେ ଗେଛେ କତକଟା ତାର ହାସି ।

କାଳୋ ଚୋଥେର ତାରା ଦିଯେଇ ସକଳ ଧରା ଦେଖି,  
କାଳୋ ଦତ୍ତେର କାଳି ଦିଯେଇ କେତାବ କୋରାନ ଲେଖି ।  
ଜନମ କାଳୋ, ଘରଣ କାଳୋ, କାଳୋ ଭୁବନମର;  
ଚାଷଦେର ଓଇ କାଳୋ ଛେଲେ ସବ କରେଛେ ଜମ ।  
ସୋନାଯ ସେ-ଜନ ସୋନା ବାନାୟ, କିସେର ଗରବ ତାର'  
ରଂ ପେଲେ ଭାଇ ଗଡ଼ତେ ପାରି ରାମଧନୁକେର ହାର ।  
କାଳୋଯ ସେ-ଜନ ଆଲୋ ବାନାୟ, ଭୁଲାୟ ସବାର ଘନ,  
ତାରିର ପଦ-ରଜେର ଲାଗି ଲୁଟାୟ ବୃଦ୍ଧାବନ ।  
ସୋନା ନହେ, ପିତଳ ନହେ, ନହେ ସୋନାର ମୁଖ,  
କାଳୋ-ବରନ ଚାଷିର ଛେଲେ ଜୁଡ଼ାୟ ଯେନ ବୁକ ।  
ଯେ କାଳୋ ତାର ମାଠେରି ଧାନ, ଯେ କାଳୋ ତାର ଗୌଣ!  
ଦେଇ କାଳୋତେ ସିନାନ କରି ଉଜଳ ତାହାର ଗୌଣ ।

ଆଖଡାତେ ତାର ବାଁଶେର ଲାଠି ଅନେକ ମାନେ ମାନୀ,  
ଖେଳାର ଦଲେ ତାରେ ନିଯେଇ ସବାର ଟାନାଟାନି ।  
ଜାରିର ଗାନେ ତାହାର ଗଲା ଉଠେ ସବାର ଆଗେ,  
'ଶାଲ-ସୁନ୍ଦି-ବେତ' ଯେନ ଓ, ସକଳ କାଜେଇ ଲାଗେ ।  
ବୁଢ଼ୋରା କମ୍ବ, ଛେଲେ ନୟ ଓ, ପାଗାଳ ଲୋହା ଯେନ,  
ବୁପାଇ ଯେମନ ବାପେର ବେଟା କେଉ ଦେଖେଛ ହେଲ ?  
ଯଦିଓ ବୁପା ନୟକୋ ବୁପାଇ, ବୁପାର ଚେଯେ ଦାମି,  
ଏକ କାଳେତେ ଓରଇ ନାମେ ସବ ଗୌ ହବେ ନାମି ।



### শব্দার্থ ও টীকা

অমর	— ভোমরা, ভিমবুল।
নবীন তৃণ	— কচি ঘাস।
জালি	— কচি, সদ্য অঙ্গুরিত।
শাওন	— শ্রাবণ, বঙাদের চতুর্থ মাসের নাম।
কালো দত	— লেখার কালি রাখার পাত্র বিশেষ, দোয়াত।
গরব	— গর্ব, অহংকার।
রামধনুকের হার	— অর্ধবৃত্তাকার রংধনুকে গলার হার হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।
পদ-রজ	— পায়ের ধুলা, চরণধূলি।
বৃন্দাবন	— মঞ্জুরি নিকটবর্তী হিন্দুদের তীর্থস্থান।
সিনান	— স্নান, গোসল।
উজ্জল	— উজ্জ্বল, দীপ্তিমান।
আখড়াতে	— নৃত্যগীত শিক্ষা ও মন্ত্রবিদ্যা অভ্যাসের স্থান।
শাল-সুন্দি-বেত	— শাল অর্থ শালগাছ বা মূল্যবান কাঠ, সুন্দি এক প্রকারের বেত। একত্রে বিবিধ কাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ। কবিতায় বুপাইকে এমনই উপকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে।
জারি গান	— শোকগীতি; কারবালার শোকাবহ ঘটনামূলক গাথা।
পাগাল	— ইস্পাত। পাগাল লোহা বলতে ইস্পাতসম কঠিন লোহাকে বোঝানো হয়েছে।

### পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারবে। তারা গ্রামীণ সৌন্দর্য সম্পর্কেও অবহিত হবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির পটভূমিতে গ্রামীণ কৃষকের শৈল্পিক রূপ অনুধাবনও করতে পারবে।

### পাঠ-পরিচিতি

কবি জসীমউদ্দীন রচিত ‘নঙ্গী কাঁথার মাঠ’ নামক কাহিনিকাব্যের এ অংশটুকু ‘বুপাই’ কবিতা নামে সংকলিত হয়েছে। এ কবিতায় কবি গ্রামবাংলার প্রকৃতি, কৃষকের রূপ ও কর্মাদ্যোগ অসাধারণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। গ্রামবাংলার প্রকৃতির মধ্যে কালো অমর, রঙিন ফুল, কাঁচা ধানের পাতা এবং কচি মুখের মায়াবী কৃষককে আয়শই দেখতে পাওয়া যায়। কৃষকের বাহু লাউয়ের কচি ডগার মতো বলে মনে হয়।

রোদে পুড়ে কৃষকের শরীরের রং কালো হয়ে যায়। এ কালো কালি দিয়েই পৃষ্ঠবীর সমস্ত কেতাব বা প্রস্তুতি

লেখা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কবির মতে, কৃষকের শ্রমেই সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছুই কৃষকের কালো। আর এ কালো কৃষকই পৃথিবীর সবকিছু জয় করেছে।

কালোকৃষকটি আখড়াতে বা জারির গানে যেমন দক্ষ তেমনি সকল কাজে পারদর্শী। তাই কবির দৃষ্টিতে এ কৃষক সবার কাছে দামি বলে গণ্য হয়েছে।

### কবি-পরিচিতি

কবি জসীমউদ্দীন ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তামুলখানা থামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি পাঁচ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। পরে তিনি সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগ দেন। ছাত্রজীবনেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তাঁর লেখা ‘কবর’ কবিতাটি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। তাঁর কবিতায় পল্লির মানুষ ও প্রকৃতির সহজ-সুন্দর রূপটি দেখতে পাওয়া যায়। পল্লির মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর কবিহৃদয় যেন এক হয়ে মিশে আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাহিনিকাব্য : ‘নক্রী কাঁথার মাঠ’, ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’; কাব্যগ্রন্থ : ‘রাখালী’, ‘বালুচর’, ‘মাটির কান্না’; নাটক : ‘বেদের মেয়ে’; উপন্যাস : ‘বোবা কাহিনী’; গানের সংকলন : ‘রঙিলা নায়ের মাঝি’। তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : ‘হাসু’, ‘এক পয়সার বাঁশী’, ‘ডালিমকুমার’। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিপ্রি এবং বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক পেয়েছেন। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

### কর্ম-অনুশীলন

- ক. ‘রূপাই’ কবিতা অবলম্বনে একজন গ্রামীণ কৃষকের চরিত্রে অভিনয় করে দেখাও (একক কাজ)।
- খ. তোমাদের সংগৃহীত গ্রামীণ ছড়া বা লোকছড়া শ্রেণিতে প্রদর্শনের আয়োজন করো (দলগত কাজ)।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘রূপাই’ কবিতাটি পল্লিকবি জসীমউদ্দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| ক. রাখালী            | খ. নক্রী কাঁথার মাঠ |
| গ. সোজন বাদিয়ার ঘাট | ঘ. বালুচর           |

২. কবি চাষির ছেলের বালুকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ক. কাঁচা ধানের পাতা    | খ. জালি লাউয়ের ডগা |
| গ. শাওন মাসের তমাল তরু | ঘ. কচি ধানের চারা   |

৩. ‘কালো দতের কালি দিয়ে কেতাব কোরান লিখি’- চরণটির ‘কালো দত’ বলতে যা বোঝানো হয়েছে-  
তা হলো:

- i. লেখার কালি রাখার পাত্রবিশেষ
- ii. কালো দন্তবিশেষ
- iii. দোয়াত

কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভোরের প্রকৃতিতে শিশিরে ভেজা কচি ঘাসের হালকা সবুজ রং আমাদের আকর্ষণ করে। মনে হয়, সবুজ  
ঘাস এক মায়াময় ছায়া বিস্তার করে আছে। এ ছায়া আমাদের মনে কোমল অনুভূতির সৃষ্টি করে।

৪. উদ্দীপকের সাথে ‘রূপাই’ কবিতার যে-চরণটির মিল পাওয়া যায়- তা হলো:

- |  |  |
|--|--|
| ক. কাঁচা ধানের পাতার মতো কচিমুখের মায়া      |  |
| খ. তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া |  |
| গ. জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দুখান সরু      |  |
| ঘ. কচিধানের তুলতে চারা হয়ত কোনো চাষি        |  |

৫. উদ্দীপক ও ‘রূপাই’ কবিতায় কবির কোন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় ?

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| ক. প্রকৃতিপ্রীতি | খ. মর্ত্যপ্রীতি |
| গ. কৃষকপ্রীতি    | ঘ. মানবপ্রীতি   |

### সূজনশীল প্রশ্ন

১। পল্লিগ্রামের পিতৃহীন এক দুরন্ত বালক ছমির শেখ। ফসল বোনার ওষ্ঠাদিতে দশগ্রামে তার সুনাম আছে।  
বন্যা-খরা তথা গ্রামের শত বিপদে বৃক্ষের ছায়ার মতো তাকে সবাই কাছে পায়। যাত্রাপালার অভিনয়ে  
তার জুড়িমেলা ভার। গ্রামের সবাই তাকে স্নেহ করে; যেমন প্রকৃতি করে গ্রামকে।

- |  |  |
|--|--|
| ক. চাষির ছেলের ‘গা-খানি’ দেখতে কেমন?   |  |
| খ. ‘চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়’- চরণটির মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? |  |
| গ. উদ্দীপক ও ‘রূপাই’ কবিতার আলোকে তোমার দেখা কোনো পল্লিগ্রামের বর্ণনা দাও।     |  |
| ঘ. ‘উদ্দীপকটি ‘রূপাই’ কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র’- যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।             |  |

## ନଦୀର ଝପ୍ତ ବୁନ୍ଧଦେବ ବଶ

କୋଥାଯ ଚଲେଛୋ? ଏଦିକେ ଏମୋ ନା!

ଦୂଟୋ କଥା ଶୋନୋ ଦିକି,  
ଏହି ନାଓ — ଏହି ଚକଚକେ, ଛୋଟୋ,  
ନତୁଳ ରଙ୍ଗୋର ସିକି ।

ଛୋକାନୁର କାହେ ଦୂଟୋ ଆନି ଆହେ,  
ତୋମାଯ ଦିଛି ତାଓ,  
ଆମାଦେର ସଦି ତୋମାର ସଜେ  
ନୌକା ତୋମାର ଘାଟେ ବାଧା ଆହେ ।

ନୌକା ତୋମାର ଘାଟେ ବାଧା ଆହେ —  
ଯାବେ କି ଅନେକ ଦୂରେ?  
ପାଯେ ପଡ଼ି, ମାଝି, ସାଥେ ନିଯେ ଚଲେ  
ମୋରେ ଆର ଛୋକାନୁରେ ।

ଆମାରେ ଚେଲୋ ନା? ଆମି ସେ କାନାଇ ।  
ଛୋକାନୁ ଆମାର ବୋନ ।

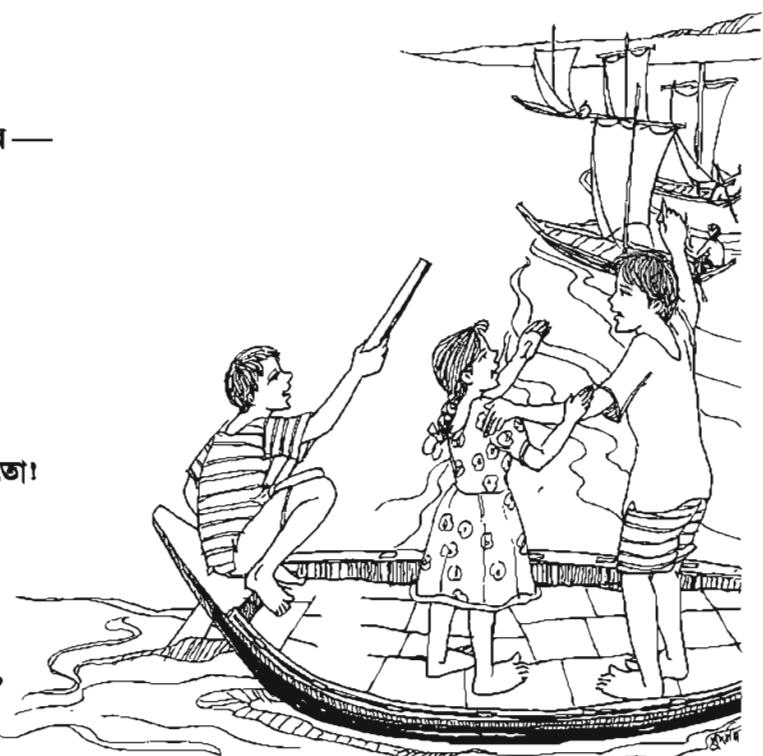
ତୋମାର ସଜେ ବେଡ଼ାନୋ ଆମରା  
ମେଘନା, ପଞ୍ଚା, ଶୋଣ ।

ଶୋନୋ, ଯା ଏଥିନ ଘୁମିଯେ ଆହେନ,  
ଦିଦି ଗେହେ ଇଶ୍କୁଳେ,  
ଏହି ଫାଁକେ ମୋରେ — ଆର ଛୋକାନୁରେ —  
ନୌକୋଯ ନାଓ ତୁଲେ ।

କୋନୋ ଭୟ ନେଇ — ବାବାର ବକୁନି  
ତୋମାଯ ହବେ ନା ଖେତେ,  
ଯତ ଦୋଷ ସବ ଆମରା — ନା, ଆମି  
ଏକା ନେବୋ ମାଥା ପେତେ ।

ଓଟା କୀ? ଜେଲେର ନୌକା? — ତାଇ ତୋ!

ଜାଲ ଟେନେ ତୋଳା ଦାୟ,  
ରଙ୍ଗୋଲି ନଦୀର ରଙ୍ଗୋଲି ଇଲିଶ —  
ଇଶ, ଚୋରେ ବଳସାଇ!  
ଇଲିଶ କିନଲେ? — ଆଃ, ବେଶ, ବେଶ,  
ତୁମି ଧୂବ ଡାଳୋ, ମାଝି ।



উনুন ধরাও, ছোকানু দেখাক  
 রান্নার কারসাজি ।  
 পইঠায় বসে ধোঁয়া-ওঠা ভাত,  
 টাটকা ইলিশ-ভাজা —  
 ছোকানু রে, তুই আকাশের রানি,  
 আমি পদ্মার রাজা ।

খাওয়া হলো শেষ, আবার চলছি  
 দুলছে ছোট্ট নাও,  
 হালকা নরম হাওয়ায় তোমার  
 লাল পাল তুলে দাও ।  
 ছোকানুর চোখ ঘুমে চুলে আসে  
 আমি ঠিক জেগে আছি,  
 গান গাওয়া হলে আমায় অনেক  
 গল্প বলবে, মাঝি?  
 শুনতে শুনতে আমিও ঘুমোই  
 বিছানা বালিশ বিনা —  
 মাঝি, তুমি দেখো ছোকানুরে, ভাই,  
 ও বড়োই ভীতু কিনা ।  
 আমার জন্যে কিছু ভেবো না  
 আমি তো বড়োই প্রায়  
 বাড় এলে ডেকো আমারে — ছোকানু  
 যেন সুখে ঘুম যায় ।

[সংক্ষেপিত]

### শব্দার্থ ও টীকা

---

- |         |   |
|---------|---|
| সিকি    | - চার আনা মূল্যের মুদ্রা বা ২৫ পয়সার মুদ্রা।                     |
| আনি     | - এক টাকার শোল ভাগের এক ভাগ মূল্যের মুদ্রা।                       |
| শোণ     | - একটি নদীর নাম।  |
| কারসাজি | - কুটকৌশল। এখানে চমৎকারিত অর্থে কাব্যিক ব্যবহার।                  |
| পাল     | - বাতাসের সাহায্যে চালাবার জন্য নৌকায় খাটানো ঘোটা কাপড়ের পর্দা। |

### গাঠের উদ্দেশ্য

---

এই কবিতা পাঠ করার কারণে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তির প্রসার ঘটবে। প্রকৃতি ও দেশের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। ভাইবনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক তৈরি হবে।

### পাঠ-পরিচিতি

---

বুদ্ধদেব বসুর 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় নদী এবং নৌভ্রমণ নিয়ে এক কিশোরের কল্পনা বৃপ্তায়িত হয়েছে। দুর্বল এক কিশোর তার ছোট বোনকে নিয়ে নৌকাতে উঠে নদীর পর নদী পার হয়ে তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়। নৌকার নানা রঙের পাল, নীল রঙের আকাশ, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির উড়ে চলা, বুপালি ইলিশ মাছ, নৌকায় রান্না করা, সন্ধ্যায় গান গাওয়া, গল্ল করা—এত কিছু কিশোর মনে গভীর স্বপ্ন নিয়ে আসে। পাশাপাশি এ কবিতায় বোনের প্রতি ভাইয়ের দায়িত্ব ও আদর প্রকাশের চমৎকার নির্দর্শন আছে।

### কবি-পরিচিতি

---

বুদ্ধদেব বসু বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি কবিতা, ছড়া, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণ-কাহিনি, সূত্রিকথা, অনুবাদ, সম্পাদনা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক (সম্মান) এবং পরের বছর প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিপ্রি অর্জন করেন। প্রথমে সাংবাদিকতা এবং পরে অধ্যাপনাকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ঢাকার পুরানা পল্টন থেকে তাঁর ও অজিত দত্তের যৌথ সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'প্রগতি' (১৯২৭-১৯২৯) প্রকাশিত হয়। তিনি 'কবিতা পত্রিকা' নামেও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যরীতির বাইরে পৃথক কাব্যধারার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কবি বুদ্ধদেব বসুর রচনাশৈলী স্বতন্ত্র ও মনোজ্ঞ। বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর অর্থাৎ বর্তমানের মুক্ষিগঞ্জে। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

### কর্ম-অনুশীলন

---

- ক. তোমার ভালো লাগার স্বপ্ন নিয়ে কবিতা, গল্প বা নাটক রচনা কর (একক কাজ)।
- খ. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটির একটি গদ্যরূপ উপস্থাপন কর (দলগত কাজ)।

ବ୍ୟାନିର୍ଦ୍ଦାତନି ପ୍ରଶ୍ନ

ନୟନୀ ପ୍ରକଳ୍ପ



নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

କିଶୋର ମୋରା ଉଷାର ଆଲୋ, ଆମରା ହାଓୟା ଦୂରତ୍ୱ,  
ଯନଟି ଚିର ବୀଧନ ହାରା, ପାଖିର ମତୋ ଉଡ଼ନ୍ତ ।

২. উদ্দীপকের দ্বিতীয় চরণের অর্থের সাথে নিচের কোন চরণের অর্থের মিল পাওয়া যায়?

  - ক. পায়ে পড়ি, মাঝি সাথে নিয়ে চলো, মোরে আর ছোকানুরে
  - খ. ছোকানু রে, তুই আকাশের রানি, আমি পদ্মার রাজা
  - গ. শুনতে শুনতে আমিও ঘুমোই – বিছানা বালিশ বিনা
  - ঘ. এই ফাঁকে মোরে—আর ছোকানুরে, মৌকোয় নাও তুলে

৩. উক্ত পঞ্জিক দুটিতে যে আবেগ প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে—

  - i. কিশোর মনের উচ্ছ্঵াস
  - ii. ভাই ও বোনের সত্যিকার মর্যাদা
  - iii. কল্পনার অবাধ প্রবাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. i ও ii	ঘ. i ও iii

সুজনশীল প্রক্র

৪. নিশ্চি, লিজা, শ্যামা, মিথিয়া, পিয়া বড়দের দৃষ্টি এড়িয়ে সাগরদিঘি পাড়ে মিলিত হয়েছে। বাঢ়ি থেকে  
চাল, ডাল, ডিম, মসলা— সবকিছু নিয়ে এসেছে। জমিয়ে পিকনিক হবে। রান্নার ধূম লেগেছে। রান্না  
শেষ হতেই নিশ্চির দেখাদেখি সবাই দিঘির জলে ঝাপিয়ে পড়ল। দাপাদাপি যেন শেষ হতেই চায় না।  
শেষে পিয়ার চেঁচামেচিতে সবাই এসে কলাপাতায় পাত পেড়ে থেতে বসল। খাবার মুখে দিয়েই এ  
ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। নুন—নুন দেয়া হয় নি যে। আবার এক দফা হেসে নিয়ে সবাই গপাগাপ  
খিচুড়ি থেতে বসে গোল। খুটুব ক্ষুধা পেয়েছে যে!

ক. দুপুরের রোদে জল কেমন করে বয়ে চলে?

খ. নৌকা-ভ্রমণের বিনিময়ে কানাই মাঝিকে আনি বা পয়সা দিতে চেয়েছিল কেন?—ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের সাথে কবিতার কী অমিল লক্ষ্য করা যায়—আলোচনা কর।

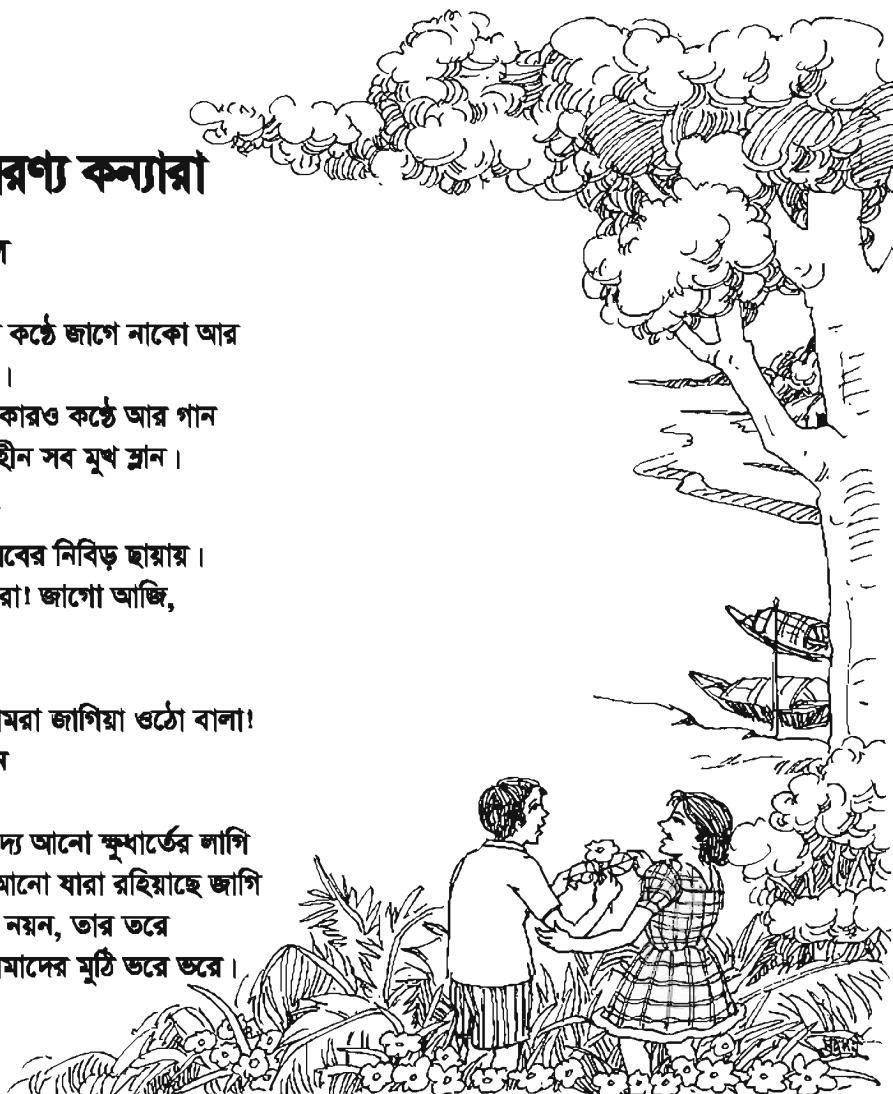
ঘ. বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও কবিতাটি কিশোর মনের আবেগ প্রকাশের দিক থেকে অভিন্ন—  
বিশ্লেষণ কর।

# জাগো তবে অরণ্য কন্যারা

সুফিয়া কামাল

মৌসুমি ফুলের গান মোর কঠে জাগে নাকো আৱ  
চাৰিদিকে শুনি হাহাকাৰ।  
ফুলের ফসল নেই, নেই কাৱও কঠে আৱ গান  
কৃষ্ণার্ত ভৱার্ত দৃষ্টি প্ৰাণহীন সব মুখ ত্ৰান।  
  
মাটি অৱশ্যের পানে চায়  
মেখানে ক্ষৰিছে স্নেহ পদ্মবেৰ নিবিড় ছায়ায়।  
জাগো তবে অৱশ্য কন্যারা! জাগো আজি,  
মৰ্মেৰ মৰ্মেৰ ওঠে বাজি  
বৃক্ষেৰ বক্ষেৰ বহিজ্বালা  
মেলি লেলিহান শিখা তোমৰা জাগিয়া ওঠো বালা!  
কজনগে তুলিয়া ছন্দ তান  
জাগাও মূরুৰু ধৰা-প্রাণ  
ফুলেৰ ফসল আনো, খাদ্য আনো কৃষ্ণার্তেৰ লাগি  
আজ্ঞার আনন্দ আনো, আনো ঘাৱা রহিয়াছে জাগি  
তিমিৰ প্ৰহৱ ভৱি অতন্ত্র নয়ন, তাৰ তৰে  
ছড়াও প্ৰভাত আলো তোমাদেৱ মুঠি ভৱে ভৱে।

[সংক্ষেপিত]



### শব্দার্থ ও টীকা

#### স্কুলার্ড ভয়ার্ট দৃষ্টি

ঞান

ক্ষরিছে

পল্লব

সেখানে ক্ষরিছে স্নেহ পল্লবের

নিবিড় ছায়ায়

জাগো তবে অরণ্য কন্যারা

বৃক্ষের বক্ষের বহিজ্বালা

মেলি লেলিহান শিখা

কঙ্কণ

মূর্মু

ধরা-প্রাণ

অতন্ত্র

নয়ন

- প্রকৃতিতে ফুল ও ফসলের সম্মান করে যাওয়ায় মানুষের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় মানুষ ভীত।
- মলিন।
- চুয়ে চুয়ে পড়েছে।
- গাছের নতুন পাতা। ডালের নতুন পাতাযুক্ত আগা।
- মাটির মমতা রস পেয়ে বৃক্ষ শাখায় নতুন পাতা গজিয়েছে।
- কবি বৃক্ষ-কন্যাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছেন প্রকৃতিকে আবার শ্যামল সবুজে ফলে-ফুলে ভরিয়ে তোলার জন্যে।
- মানুষ প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করায় বন উজাড় হচ্ছে। বৃক্ষনিধন বাঢ়ে। বৃক্ষের বুকে তাই যন্ত্রণার আগুন।
- কবি তরু কন্যাকে আহ্বান জানাচ্ছেন তার শাখায় শাখায় আগুন রঙা ফুল ফুটিয়ে আকাশে শাখা বিস্তার করতে।
- কাঁকন, নারীর হাতের অলঙ্কার বিশেষ।
- মৃতপ্রায়। মরণাপন্ন। মরে যাচ্ছে এমন।
- পৃথিবীর জীবন।
- তন্দুরাইন। ঘুমহীন। নির্ধূম। নিদুরাইন।
- চোখ।

#### পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতি জগতের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগে আগ্রহী হবে এবং প্রকৃতির ঐশ্বর্য রক্ষায় সচেতন হবে।

#### পাঠ-পরিচিতি

‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতাটি সুফিয়া কামালের ‘উদাত্ত পৃথিবী’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। প্রকৃতির রূপ-সচেতন কবি চারপাশের অরণ্য-নিধন লক্ষ্য করে ব্যথিত। তাই মৌসুমি ফুলের গান আর তার কষ্টে জাগে না। বরং চারপাশে সবুজ প্রকৃতির বিলীন হওয়া দেখে তাঁর মন হাহাকার করে ওঠে। কবি তাই অরণ্য-কন্যাদের জাগরণ প্রত্যাশা করেন। তিনি চান দিকে দিকে আবার সবুজ বৃক্ষের সমারোহের সৃষ্টি হোক; ফুলে ও ফসলে ভরে উঠুক পৃথিবী; মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা পাক বিপন্নতার হাত থেকে।

#### কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল কুমিল্লায়। সে আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার মোটেই সুযোগ ছিল না। তিনি নিজের চেন্টায় লেখাপড়া শিখে ছেটবেলা থেকেই কবিতাচর্চা শুরু করেছিলেন। কিছুকাল তিনি কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা ও নারীকল্যাণমূলক নানা কাজের সঙ্গে

জড়িত ছিলেন। তাঁর কবিতা সহজ, ভাষা সুলিলিত, ছন্দ ব্যঙ্গনাময়। কবি সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য কাবগ্রন্থ হলো : ‘সাঁবের মায়া’, ‘মায়া কাজল’, ‘মোর যাদুদের সমাধি পরে’। তাঁর অতিকথামূলক গ্রন্থ ‘একান্তরের ডাইরি’; শিশুদের জন্য তিনি লিখেছেন ‘ইতল বিতল’ ও ‘নওল কিশোরের দরবারে’।

কবি সুফিয়া কামাল তাঁর কবি প্রতিভার জন্য অনেক পূর্ণস্কার লাভ করেছেন। সেসব হলো : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, একুশে পদক, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি পুরস্কার, মুক্তধারা ও স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার, সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি। তিনি ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

କର୍ମ-ଅନୁଶୀଳନ

- ক. প্রকৃতিতে রক্ষার ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন উকি যুক্ত করে পোস্টার তৈরি কর (একক কাজ)।  
 খ. বাড়িতে একটি গাছ লাগাও এবং এই ছবি শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা কর।

ନୟନୀ ପ୍ରଶ୍ନ

বঙ্গনির্বাচনি প্রশ্ন



নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলছে। এ বাড়তি জনসংখ্যার জন্য প্রতিনিয়ত করছে আবাদি জমি, বন, জঙ্গল। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা—ঘটছে পরিবেশ বিপর্যয়। বিষয়টি উপলব্ধি করে মফিজ খাঁ এবং আমিনা বেগম বৃক্ষমেলা থেকে প্রচুর চারা কিনে এনে এলাকার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু করেন।

৫. এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ‘জাগো তবে অরণ্য কল্যারা’ কবিতায় যে নির্দেশনা রয়েছে তা হলো—
- লাগাও গাছ, বাঁচাও দেশ
  - বৃক্ষ মাটির মুক্তিদাতা
  - চারিদিকে সবুজের সমারোহ সৃষ্টি হোক

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. দোয়েল পাখি বাসা বেঁধেছে জবা গাছে। সোহেল তার নতুন ঘর তোলার জন্য আঙিনার অন্যান্য গাছের সাথে জবা গাছও কেটে ফেলে। দোয়েলের ঢাক্ষে-মুখে বাসা হারানোর বেদন। দোয়েল আর গান গায় না। ফুলের সাথে খেলা করে না। অন্যদিকে নিলয় তার বাড়ির আঙিনার খালি জায়গায় ফুল, ফল ও অন্যান্য গাছ লাগায়। গাছগুলোকে সে নিজের মতো ভালোবাসে। তার বাগান দেখে সকলের ঢাক্ষ জুড়ায়। পাখিরা তার বাগানে চলে আসে। তারা গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন ফলের গাছ থেকে খাদ্য জোগাড় করে, ফুলের সাথে খেলা করে, গান গায়। দিনের শেষে নিশ্চিন্ত মনে বাসায় ফিরে ঘুমায়। নিলয়কে দেখে অনেকেই গাছ লাগাতে উদ্বৃদ্ধ হয়।
- ক. গাছের নতুন পাতাকে কী বলে?  
 খ. ‘বৃক্ষের বক্ষের বহিজ্ঞালা’ বলতে কী বুঝানো হয়েছে ?  
 গ. দোয়েলের অভিব্যক্তিতে ‘জাগো তবে অরণ্য কল্যারা’ কবিতার কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. উদ্দীপকের নিলয়ের কর্মকাণ্ডের মধ্যেই কবির প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে। বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর।
২. সিডরের খবর শুনে মিথিয়ার ভীষণ মন খারাপ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ ঘর-বাড়ি হারা, খাবার নেই। কী ভীষণ বিপন্ন মানুষ। অথচ এর জন্য মানুষই অনেকটা দায়ী। মানুষ গাছ কেটে বন উজাড় করছে। ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে। এসব দেখে মিথিয়া অনুভব করে একটা কিছু করবে। সে তার বন্ধুদের নিয়ে বাড়ির খালি আঙিনায়, ছাদে গাছ লাগানোর জন্য মানুষকে সচেতন করে তোলে। তাছাড়া গাছ কেটে বন উজাড় করার বিরুদ্ধে সে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সে ভাবে এই সুন্দর বনই অনেক বেশি ক্ষতির হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। মিথিয়া স্বপ্ন দেখে ফুলে-ফলে ভরা সতেজ-সবুজ প্রকৃতির।
- ক. কবি সুফিয়া কামাল এখন আর কীসের গান শুনতে পান না ?  
 খ. ‘ক্ষুধার্ত ভয়াত দৃষ্টি’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন ?  
 গ. মিথিয়ার মন খারাপের বিষয়টির সাথে ‘জাগো তবে অরণ্য কল্যারা’ কবিতার কোন দিকটির মিল খুঁজে পাওয়া যায় ? ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. মিথিয়া যেন কবির সেই অরণ্য-কল্যা-উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

## ପ୍ରାଣୀ

### ସୁକାନ୍ତ ଝାଟାର୍ଚ

ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ! ଶୀତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ!  
ହିମଶୀତଳ ସୁଦୀର୍ଘ ରାତ ତୋମାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାୟ  
ଆମରା ଧାକି,  
ମେଘନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ ଥାକେ କୃଷକେର ଚଖଳ ଚାର୍ଖ  
ଧାନକଟାର ରୋମାଞ୍ଜକର ଦିନଗୁଲିର ଜନ୍ୟେ ।

ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁମି ତୋ ଜାନୋ,  
ଆମାଦେର ଗରମ କାପଡ଼େର କତ ଅଭାବ!  
ସାରାରାତ ଖଡକୁଟୋ ଝାଲିଯେ,  
ଏକ ଟୁକରୋ କାପଡେ କାନ ଢକେ,  
କତ କଟେ ଆମରା ଶୀତ ଆଟକାଇ!

ସକାଳେର ଏକ ଟୁକରୋ ରୋଦୁର—  
ଏକ ଟୁକରୋ ସୋନାର ଚେଯେଏ ମନେ ହୟ ଦାମି ।

ଘର ଛେଡେ ଆମରା ଏଦିକ-ଓଦିକେ ଯାଇ—  
ଏକ ଟୁକରୋ ରୋଦୁରେର ତୃକ୍ଷାୟ ।

ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ!  
ତୁମି ଆମାଦେର ସ୍ୟାତସେତେ ଭିଜେ ଘରେ  
ଉତ୍ତାପ ଆର ଆଲୋ ଦିଓ,  
ଆର ଉତ୍ତାପ ଦିଓ  
ରାମତାର ଧାରେ ଏଇ ଉଲଙ୍ଘା ଛେଲେଟାକେ ।

ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ!  
ତୁମି ଆମାଦେର ଉତ୍ତାପ ଦିଓ—  
ଶୁନେଇ, ତୁମି ଏକ ଝଲକ ଅଶ୍ଵିପିତ,  
ତୋମାର କାହେ ଉତ୍ତାପ ପେଯେ ପେଯେ  
ଏକଦିନ ହସତୋ ଆମରା ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ  
ଏକ ଏକଟା ଝଲକ ଅଶ୍ଵିପିତେ ପରିଣତ ହବ!  
ତାରପର ଦେଇ ଉତ୍ତାପେ ସବୁ ପୁଢ଼ିବେ ଆମାଦେର ଜଡ଼ତା,  
ତଥନ ହସତୋ ଗରମ କାପଡେ ଢକେ ଦିତେ ପାରବ  
ରାମତାର ଧାରେ ଏଇ ଉଲଙ୍ଘା ଛେଲେଟାକେ ।

ଆଜ କିନ୍ତୁ ଆମରା ତୋମାର ଅକ୍ଷୟ ଉତ୍ତାପେର ପ୍ରାଣୀ ॥

## শব্দার্থ ও টীকা

প্রার্থী	— প্রার্থনাকারী, আবেদনকারী।
হিমশীতল	— তুষারের মতো ঠাণ্ডা।
স্যাতসেঁতে	— ভেজা ভাবযুক্ত।
অগ্নিপিণ্ড	— আগুনের গোলা।
জড়তা	— জড়ের ভাব, আড়ফ্টতা।
অকৃপণ	— কৃপণ নয় এমন। উদার।

## পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে অবহেলিত, বঞ্চিত ও দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি মমতা সৃষ্টি হবে। অনুহীন, বন্ধুহীন ও আশ্রয়হীন মানুষের দুর্দশায় তারা ব্যথিত হবে।

## পাঠ-পরিচিতি

‘প্রার্থী’ কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘ছাড়পত্র’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। আমাদের এই পৃথিবীতে শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্য যে তাপ বিকিরণ করে তার সাহায্যেই ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ, জীবজন্ম ও মানুষ জীবনধারণ করে। প্রচড় শীতে সূর্যের এই উত্তাপের জন্য সারারাত অপেক্ষা করে বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন শীতাত্ত মানুষ। কবি সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতি গভীর মমতা থেকে সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন। অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুর প্রতি তাঁর অসীম মমতা। কবি এই শিশুদের কল্যাণে সূর্যের অবদান থেকে প্রেরণা নিতে চান। তিনি এমন সমাজ গড়তে চান— যাতে বন্ধুহীন শীতাত্ত মানুষের জীবন থেকে সব দুঃখ চিরতরে ঘুচে যায়।

## কবি-পরিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এই সন্তান অঞ্চল বয়সেই শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তোলেন। বামপন্থ-বিপ্লবী কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। বন্ধুহীন মানুষের জীবন-যন্ত্রণার চিত্র যেমন তাঁর কবিতায় অঙ্গিকৃত হয়েছে তেমনি প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের সুর উচ্চারিত হয়েছে। তিনি সেকালের দৈনিক পত্রিকা ‘স্বাধীনতা’র কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। আম্ভুত্য তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কবিতায় মানবমুক্তির জয়গান বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম : ‘ছাড়পত্র’, ‘সুম নেই’, ‘পূর্বাভাস’, ‘অভিযান’, ‘হরতাল’ ও ‘গীতিগুচ্ছ’। সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র একুশ বছর বয়সে যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

## কর্ম-অনুশীলন

ক. ‘সামাজিক বৈষম্য জাতীয় অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা’ – এই মতের পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্কের আয়োজন করো (দলগত কাজ)।

খ. গত সংগ্রহে কে, কী ধরনের ভাল কাজ করেছ, এর একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো (একক কাজ)।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বন্ধনবিচারনি প্রশ্ন

---

১. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মারা যান ?

- |       |       |
|-------|-------|
| ক. ২১ | খ. ২২ |
| গ. ২৩ | ঘ. ২৫ |

২. সকালের এক টুকরো রোদকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে ?

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ক. কৃষকের চপ্পল ঢাক্কা | খ. এক টুকরো সোনা        |
| গ. এক টুকরো গরম কাপড়  | ঘ. এক জলাঞ্জ অগ্নিপিণ্ড |

৩. সূর্যের কাছে রাস্তার ধারের উলঙ্ঘা ছেলেটার জন্য উত্তাপ চাওয়ার মধ্যে কবির যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

- i. সহযোগিতা
- ii. সহমর্মিতা
- iii. সহনশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |       |                |
|-------|----------------|
| ক. i  | খ. iii         |
| গ. ii | ঘ. i, ii ও iii |

#### উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

লিয়াকতের বাবা অর্থাত্বাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। সেই থেকে সে প্রচন্ড শোক বুকে নিয়ে ঢাকা শহরে রিকশা চালিয়ে তিল তিল করে সঞ্চয় করে কিছু টাকা। আর সে টাকা দিয়ে তার গ্রামের বাড়িতে গড়ে তোলে একটি হাসপাতাল; যাতে কোনো অসহায়, দুঃস্থ মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়।

৪. লিয়াকতের কার্যক্রমে ‘প্রার্থী’ কবিতার যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা হলো—

- i. মহানুভবতা
- ii. মানবতা
- iii. মমত্ববোধ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |       |                |
|-------|----------------|
| ক. i  | খ. iii         |
| গ. ii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. ‘প্রার্থী’ কবিতায় কবি সুকান্তের জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড হওয়া আর উদ্দীপকে লিয়াকতের শোকগ্রস্ত হওয়া আসলে—
- আর্ত-মানবতার কল্যাণ করা
  - কল্যাণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হওয়া
  - মানুষ মানুষের জন্য—এ সত্ত্যে উদ্বৃদ্ধ হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. নাদিম সাহেব দামি গাড়ি হাঁকিয়ে অফিসে যাবার পথে রাস্তার সিগন্যালে অপেক্ষা করেন। জীর্ণ-শীর্ণ এক ভিক্ষুক তাঁর গাড়ির জানালার পাশে ভিক্ষার থালা বাঢ়িয়ে দিলে তিনি জানালার কালো প্লাস তুলে দেন। আর ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, ভিক্ষুকে দেশটা ভরে গেছে। কথা শুনে ড্রাইভার মহসীন বলে— স্যার, গবিন মানুষ, কী করবে বলেন? এই ভিক্ষার আয় রোজগার দিয়েই তো ওরা সংসার চালায়।

- ‘প্রার্থী’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত ?
- কবি সূর্যকে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড বলেছেন কেন ?
- উদ্দীপকের নাদিম সাহেবের আচরণ ‘প্রার্থী’ কবিতার কোন ভাবের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ?— বর্ণনা কর।
- ড্রাইভার মহসীনের অভিব্যক্তিতে ‘প্রার্থী’ কবিতার মূল চেতনা প্রকাশ পেলেও কবি সুকান্তের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নি— মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

২. ‘দেখিনু সেদিন রেলে,  
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে !  
চোখ ফেটে এল জল,  
এমনি ক’রে কী জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল ?’

- ‘হিমশীতল’ অর্থ কী ?
- আমাদের গরম কাপড়ের অভাব কীভাবে দূর হতে পারে ? ব্যাখ্যা কর।
- কবিতাঙ্শের প্রথম তিন চরণে ‘প্রার্থী’ কবিতার যে দিকটির সাথে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তার বর্ণনা দাও।
- উদ্দীপকের শেষ চরণের বক্তব্যে ‘প্রার্থী’ কবিতায় কবির অভিমতের প্রতিফলন ঘটেছে কী? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।



## একুশের গান

আবদুল গোফর তোহুৰী

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে কেন্দ্রারি

আমি কি ভূলিতে পারি

হেসেহাজা শত যাত্রের অঞ্চ-গঞ্চা এ কেন্দ্রারি

আমি কি ভূলিতে পারি

আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো কেন্দ্রারি

আমি কি ভূলিতে পারি ।

আগো নাপিনীরা আগো নাপিনীরা আগো কালবোশেধিরা

শিশু-হত্যার বিকেোতে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,

দেশের সোনার হেলে খুন করে ঝোখে মানুবের দানি

সিস বদলের ক্রান্তি লানে তবু তোমা পার পাবি?

বা, না, না, না, খুন-রাঙা হাতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই

একুশে কেন্দ্রারি, একুশে কেন্দ্রারি ।

সেন্টিলও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে

রাত আগা টাস চুমো খেয়েছিল হেসে;

পথে পথে ফোটে রজনিগঙ্গা অলকানন্দা যেন,  
এমন সময় বড় এলো এক, বড় এলো ক্ষ্যপা বুনো ॥

সেই আধারের পশুদের মুখ চেনা  
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা  
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোধে  
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে  
ওরা এদেশের নয়,  
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়  
ওরা মানুষের অন্ন, বন্ত, শান্তি নিয়েছে কাড়ি  
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি  
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর-ছেলে বীর-নারী  
আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে  
জাগো মানুষের সুষ্ঠ শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে  
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার ঝালব ফেব্রুয়ারি  
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

### শব্দার্থ ও টীকা

---

রক্তে রাঙানো	— বহু মানুষের আত্মোৎসর্গে সিক্ত বা উজ্জ্বল ।
অশ্ব-গড়া	— ঢোকের পানিতে নির্মিত ।
বসুন্ধরা	— পৃথিবী ।
ক্রান্তি	— পরিবর্তন ।
লগন	— লঘ, উপযুক্ত বা শুভ সময় ।
অলকানন্দা	— একটি ফুলের নাম ।
ওরা গুলি ছোড়ে	— এখানে পাকিস্তানি পুলিশকে বোঝানো হয়েছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর তারা গুলি ছুড়েছিল ।

### পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা-আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগ নিয়ে একদিকে গর্ব করতে শিখবে, অন্যদিকে তারা শহিদের রক্তের খণ্ড শোধ করার জন্য সব ধরনের অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।

### পাঠ-পরিচিতি

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ সংকলনে ‘একুশের গান’ প্রথম ছাপা হয়। এখানে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত ভাষা-আন্দোলনে বাঙালি ছাত্র-জনতার আত্মোৎসর্গকে স্মরণ করা হয়েছে। ভাষা-আন্দোলনের রক্তদান কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না। এখানে অন্যায়ভাবে গুলিবর্ষণকারী তৎকালীন পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির জাগ্রত্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

କବି-ପରିଚିତି

আবদুল গাফর চৌধুরী কথাশিল্পী, গীতিকার, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট হিসেবে খ্যাতিমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিপ্রি অর্জন করে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সমাজমনস্ক লেখক হিসেবে ভাষা-আন্দোলন (১৯৫২) ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) চলাকালে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ গ্রন্থ হলো ‘ডানপিটে শওকত’, ‘আঁধার কুঠির ছেলেটি’ ইত্যাদি। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, ইউনেস্কো পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু পুরস্কারসহ বিভিন্ন পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ শে মে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

କର୍ମ-ଅନୁଶୀଳନ

- ক. একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্যাপন উপলক্ষে একটি দাওয়াতপত্র তৈরি করো (একক কাজ)।  
খ. একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ করে তোমাদের লেখা কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ নিয়ে একটি দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করো (দলগত কাজ)।

ନୟନା ପ୍ରଶ୍ନ

ବ୍ୟାନିର୍ବାଚନ ପତ୍ର



কবিতাংশটি পড়ে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

‘ଆମାର ବୃଦ୍ଧ ପିତାର ଶରୀରେ  
ଏଥନ ପଶୁଦେର ପ୍ରହାରେ  
ଚିତ୍ତः’

২. কবিতাংশের ভাবের সাথে নিচের কোন লাইনটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

  - ক. তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেরুয়ারি
  - খ. দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালব ফেরুয়ারি
  - গ. দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
  - ঘ. দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?

৩. উদ্ধীপকে বর্ণিত পশুদের ন্যায় ‘একুশের গান’ কবিতায় পশু হচ্ছে—

  - i. ওরা এদেশের নয়—চরণের ‘ওরা’
  - ii. দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি? —চরণের ‘তোরা’
  - iii. তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেরুয়ারি— চরণের ‘তুমি’

### নিচের কোনটি সঠিক

- ক. i ও ii  
গ. ii ও iii

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. ‘বাড়ের রাত্রে, বৈশাখী দিনে, বরষার দুর্দিনে  
অভিযাত্রিক, নিতীক তারা পথ লয় ঠিক চিনে।  
হয়তো বা ভুল, তবু ভয় নাই, তরুণের তাজা প্রাণ  
পথ হারালেও হার মানে নাকো, করে চলে সম্মান  
অন্য পথের, মুক্ত পথের, সম্মানী আলো জ্বলে  
বিনিদৃ আঁধি তারকার সম, পথে পথে তারা চলে।’
  ২. ‘ওরা কেড়ে নিতে চায় বুকের শশ, মায়ের মুখের ভাষা  
ঝরিয়ে রান্ত, ভাইয়ের প্রাণ, হৃদয়ের ভালোবাসা।  
জেগে উঠো আজ সাহসী ঘৌবন, আনো নব উথান  
দোহের আগুনে পোড়াও শুদ্রের, গাও বিজয় গান।’
- ক. ‘একুশের গান’ কবিতাটি কোন শহিদের স্মরণে লেখা হয়েছে?  
 খ. ‘সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেন’—চরণটি ব্যাখ্যা কর।  
 গ. দ্বিতীয় উদ্দীপকের আলোকে ‘একুশের গান’ কবিতায় বর্ণিত ‘ওরা এদেশের নয়’— চরণটি ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. প্রথম উদ্দীপকের যিনি অভিযাত্রিক তিনিই ‘একুশের গান’ কবিতার ভাষা-শহিদ – বিশ্লেষণ কর।

### সমাপ্ত

স্বাধীনতার  
৫০  
বছর  
উন্নয়ন আমারও



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ'

বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক প্রযুক্তি সর্বাধিক নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি। বিশ্বে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ১০ ভাগ আসে পারমাণবিক প্রযুক্তি খাত থেকে। বাংলাদেশও বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের মতো ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য স্বল্প মূল্যে উৎপাদিত পরিবেশ বান্ধব এই প্রযুক্তির ব্যবহার করার প্রয়াসে পাবনা জেলার রূপপুরে দুই ইউনিট বিশিষ্ট পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে। প্রতিটি ইউনিট প্রায় ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে। ১৯৬১ সালে পাবনা জেলায় ৬৩২ একরের উপর এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও তা স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে শেখ হাসিনা সরকারের উদ্যোগে ২০১৭ সালের নভেম্বরে প্রথম ইউনিট ও ২০১৮ সালে দ্বিতীয় ইউনিটের নির্মাণ কাজ শুরু হয় যা ২০২৩ বা ২০২৪ সাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে।



দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে  
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

## পরিনিদা ভালো নয়

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩০৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে  
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য